বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১২

কলিকাতা,
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ "দিনময়ী প্রেসে"
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য উপন্যাস।

১। শাক্তকানন (বাঁধাই) ২য় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ) ... ... ১।০

২। ফুলজানি (২য় সংস্করণ বাঁধাই) ... ... ১।০

৩। বিশ্বনাথ (বাঁধাই) ২য় সংস্করণ ... ... ১।০

(বিনা বাঁধাই প্রত্যেকখানি ১৲ এক টাকা করিয়া)

৪। কৃতজ্ঞতা ৸০

গ্রন্থকারের নিবেদন।

"সাহিত্যে" এই উপন্যাস "প্রতিশোধ" নামে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার আগাগোড়া বিশে ডাকাতের কথায় পূর্ণ বলিয়া নামটি পরিবর্ত্তিত হইল। গল্পাংশেও স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

খৃঃ ১৮৮৫ অব্দের শরৎকালে প্রথম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমি নদীয়া জেলায় প্রেরিত হই। সেই সময়ে বিশ্বনাথের সংবাদ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম। "বালক" নামক মাসিক পত্রে নদীয়া ভ্রমণ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশ্বনাথের কথা কিছু ছিল। কিন্তু সে সামান্য মাত্র। অধিকাংশ কাহিনী গত বৎসরে সাংসারিক ও বৈষয়িক নানা ঝঞ্ঝাট এবং অনবসর মধ্যে সংগৃহীত। বিশ্বনাথের সম্বন্ধে যাঁহাদের ভাল জানা শুনা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সহায়তা করিলে, ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণতা দুর হইতে পারিবে।

রাঁচি;
ভাদ্র, ১৩০৩।

বিশ্বনাথ

বিশ্বনাথ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভরা ভাদ্রে চূর্ণী নদী কূলে কূলে পূরিয়া উঠিয়াছে। তীরের বাঁশঝাড় গুলি, লতাসমাচ্ছন্ন আগাছার সারি, প্রায় আগ্রীব ডুবিয়া গিয়াছে। নদীর খর স্রোত তাহাদের শাখায় প্রশাখায় প্রহত হইয়া স্থানে স্থানে ঈষৎমাত্র বাঁকিয়া চলিয়াছে। নদীকূলে কোমল তৃণশোভা আর বড় দেখা যায় না,—প্রায় সর্ব্বত্র নিবিড় হরিৎ ধান্যক্ষেত্র।

নদীর ধারে দেবীপুর নামে ক্ষুদ্র পল্লী, তিন দিকে বন্যাজলে বেষ্টিত। সরোবরবক্ষঃস্থ কুবলয়কুঞ্জে জলচর পক্ষীর নীড়ের মত, তালনারিকেলবন-খচিত ক্ষুদ্র গ্রামখানি জলে ভাসিতেছে। তাহার বাঁধা ঘাটে নৌকা বাঁধা এবং ঘাটের উপর শিবমন্দির-সম্মুখস্থ অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় অনেকগুলি স্ত্রীলোকের সমাগম দেখিয়া মনে হইতেছিল, আজ বুঝি কোন পর্ব্বদিন।

বাস্তবিক কিন্তু কোন পর্ব্বদিন নহে। কুলীন-ব্রাহ্মণ-কন্যা সরলা আঠার বছর বয়সে সবে প্রথম শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছে, তাই আজ দেবী-পুরের এ জীবন্ত ভাব। সরলা আর কখনও গ্রামের বাহির হয় নাই। ছেলেবেলায় মার সঙ্গে দুই চারি বার গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, আবছায়ার মত মনে পড়িতেছে। সম্প্রতি মাতৃহীনা হওয়ায় সে অভিভাবিকামাত্র-

শূন্য হইয়াছে,—এক শ্বশুরালয় ছাড়া ত্রিকুলে আর আশ্রয়স্থান ছিল না। মাতার ত্যক্ত ব্রহ্মোত্তর জমীগুলি এবং ভদ্রাসন অবলম্বন করিয়া, দেবীপুরে বাস করিতে গ্রামবাসীরা সরলাকে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়সে সেখানে একাকিনী বাস করিতে তাহার সাহস হইল না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইদানীং গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে বাটীর অঙ্গনে ঢিল পাটকেল আসিয়া পড়িত, এবং সরলার শয়নসঙ্গিনী আকালের মাও নাকি দুই দিন তিন চারি জন লোকের পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল।

অতএব কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, সরলা এই ভাদ্র মাসেই শ্বশুরবাড়ী যাইবে, স্থির করিল। সে অনেক দূর,—নৌকাপথে আড়াই দিনের পথ। নয় বছর বয়সে সরলার বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কপালে কখন স্বামিসম্ভাষণ ঘটে নাই। এই নয় বছরের ভিতর স্বামী মহাশয় আরও দ্বাদশটি ছোট বড় কুলীনদুহিতার পাণিপীড়ন করিয়াছেন, ভর্ত্তার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় সরলা সুতরাং তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল না। যাঁর হাতে সমর্পণ করিয়া মাতা কন্যার নারীজন্ম সফল হইল ভাবিয়াছিলেন, এই নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় তিনি কি চরণে ঠাঁই দিবেন না? সেই আশা এবং আকাঙ্ক্ষায় সরলা অশৈশবের বাসভূমি ছাড়িয়া সংসারসাগরে ঝাঁপ দিল।

আকালের মা অনেক দিনের মানুষ, সরলার মাতামহীর সমবয়স্কা। সরলার মাতাকে সে মানুষ করিয়াছিল। এ জন্য সরলা তাকে আয়ি বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, "সলি, ভাদ্দর মাসে কুকুর বিড়ালের বাড়ী ছেড়ে যেতে নেই, আর একটা মাস কোন রকমে থেকে যাও।" সরলা বলিল, "আয়ি, কুকুর বিড়েলকেও আহা করার লোক আছে—কিন্তু আমার কে আছে বল্? শেষে কি এখান থেকে একটা অখ্যাত নিয়ে বেরুব!" বুড়ি এই যুক্তিতে নিরুত্তর হইল। অতঃপর পাড়া প্রতিবেশিনীরা ভাদ্র মাসের দোহাই দিয়া সরলার যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা করিলে আকালের

মা বলিত, “বাবা ঠাকুর স্বপন দিয়েচেন, সোয়ামির কাছে যেতে দিন ক্ষণ দেখ্‌তে নেই!”

সরলার মা ধান্য বাড়ি দিয়া এবং কিছু কিছু মহাজনী করিয়া গ্রামের “ছোট লোক” গুলিকে বাধ্য করিয়াছিলেন; ইহাতে পল্লীর এবং পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামসমূহের ভদ্র ও অভদ্র সমাজে ব্রাহ্মণবিধবার ধনশালিনী বলিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। আজিকালিকার দিনে ইনকম্ ট্যাক্সের বিভীষিকা ছাড়া অন্য ভয় বড় থাকে না, কিন্তু সে কালে যারা আয়-কর সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত, লোকে তাহাদিগকে ডাকাইত বলিত। অতএব সরলার শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিক্ ঠাক্ হইলে, গ্রামস্থ বাগ্দী-জাতীয় চারি জন লোক লাঠি সড়কী লইয়া আপনা হইতে নৌকায় গিয়া উঠিল। সরলাকে বুঝাইল, “দিদি ঠাকরুণ গো, ছেরক কাল তোমাদের খেয়ে মানুষ, পথে যদিই তুমি কোন আপদে বিপদে পড়, আমাদের নেমকহারাম নাম কিছুতেই ঘোচবে না।” আকালের মা বহুকাল পূর্ব্বে পুত্রহীনা হইয়া-ছিল—ভববন্ধন আর বড় কিছু ছিল না। সেও সরলার সঙ্গে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবীপুর ছাড়িয়া যাইতে সরলার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। আপনার বলিতে সেখানে কেহ আর ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি সেই মাতৃ ভিটা টুকুর সঙ্গে কত স্নেহ মায়া জড়িত! ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতা আমাদের স্নেহপ্রস্রবণ হৃদয়কে শোণিতসম্পর্কের গণ্ডী মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে চায়; কোথা হইতে প্রেম আসিয়া ধীরে ধীরে বলে, এই বৃক্ষলতা পশু পক্ষী, প্রতিবেশীর এই শিশু পুত্র কন্যা—এ সব তোমার নিজের। প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত বায়ু-প্রবাহ এবং অনন্ত উদার আকাশের মত স্থাবর জঙ্গম সবই যে তোমার নিতান্ত আপনার, ইহাতে সন্দেহ করিও না।

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সরলা নৌকায় গিয়া উঠিল। সন্ত মাতৃশোক আজ আবার নূতন করিয়া উছলিয়া উঠিয়াছিল—যে কিছুর সঙ্গে মাতার মধুর স্মৃতি জড়িত, সকলেরই কাছে আজ চিরবিদায় লইতে হইয়াছে। প্রতিবেশিনীরা অনেকেই উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছিল। সরলা কখন গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে জানে না,—চোখের জল মুছিতে মুছিতে ধীর পদে সে যখন নৌকায় গিয়া উঠিল, তীরের লোকেদের মনে হইল, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী গ্রাম ছাড়িয়া অনিচ্ছায় চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌকা নদীস্রোতে ছুটিয়া চলিল। জ্ঞান হইয়া অবধি সরলা কখন দেবীপুরের বাহির হয় নাই ; মনটা ভাল না থাকিলেও মুক্ত প্রকৃতির প্রাবৃটোৎসব দেখিতে দেখিতে সে আত্মবিস্মৃত হইতেছিল। কত ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রাম, কত উদ্যান, কত দেবালয় দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল,—নৌকার ভিতর পর্দ্দার মধ্যে বসিয়া ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে সরলা এক মনে সকলই দেখিতেছিল।

এইরূপে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। আকালের মা ততক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া পর্দ্দার বাহিরে শয়ন করিয়াছিল। প্রথমত অনেকক্ষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনিয়া নৌকারোহীরা ভাবিয়াছিল বুড়ীর মন কেমন করিতেছে, কিন্তু ক্রমে তাহা গভীর নাসিকাগর্জ্জনে পরিণত হইয়া আসিল। অতএব বুড়ী যখন উঠিয়া বসিল, এবং সরলা কাঁদিতেছে কি না দেখিবার জন্য পর্দ্দার ভিতর প্রবেশ করিল, সরলা তখন স্থির দৃষ্টিতে একটা কিছু দেখিতেছে। এইখানে চূর্ণী নদী কতকটা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে—দুই প্রবাহের বক্ষঃস্থলে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর নিবিড় বটচ্ছায়া এক অতি জীর্ণ শিবমন্দির প্রমুখ ইষ্টকালয়কে আশ্রয় দিয়াছে। প্রকাণ্ড বটগাছের শাখা প্রশাখা মাঝে মাঝে ভূমিশায়ী হইয়া আছে—কচিৎ একটা জটা অথবা একটা শাখা নদী-স্রোতে প্রহত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে।

সরলা দেখিতে পাইল, বটগাছের নিবিড় ছায়া-মধ্যে দুইখানা দীর্ঘ পান্সী কাণ্ডসংলগ্ন হইয়া আছে।

এইখানে নদীর দুই ধারে বন অতি নিবিড়। এবং নদী দ্বিধাভিন্ন হইলেও স্রোতের বেগ অতি তীব্র। মাঝিরা নৌকা লইয়া ব্যতিব্যস্ত, বটচ্ছায়ায় লুক্কায়িত পান্সীযুগল তাহারা কেহ দেখিতে পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পান্সী দুই খানা দেখিয়া সরলা শিহরিয়া উঠিল বটে, কিন্তু স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিবলে সে আকালের মাকে আশঙ্কার কথা কিছু জানিতে দিল না। নদীতীরের বনদেশ হইতে কদম্ব কেতকীর ঘ্রাণ আসিতেছিল—আকালের মা নিকটে আসিবামাত্র সরলা সেই দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিল। ইহাতে বুড়ী সহজেই ভাবিল, গোটাকতক কেয়া ফুল আহরণ করিতে পারিলে "সলিকে" খুসী করিতে পারা যাইবে। অতএব সে বাগ্দী চারি জনের ভিতর এক জনকে ডাকিয়া বলিল, "বদন, তোর দিদিঠাক্‌রুণের জন্যে গোটা চারেক কেয়ার ফুল তুলে আন্ না ভাই,—নাতজামাইকে ভেট দেবে। নৌকো বাঁধ্। কি বলিস্ দিদিমণি!"

তখন নৌকা "দ্বীপ" বেষ্টন শেষ করিয়া উভয় স্রোতের সন্ধিস্থলে প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে।—খরপ্রবাহে নৌকা স্থির রাখিতে মাঝিমাল্লা এবং সর্দ্দারেরা সকলেই ব্যস্ত। আকালের মার কথা কেহ শুনিতে পাইল না। তাহাতে বুড়ী তাহার সহজকর্কশ কণ্ঠ আরও চড়াইয়া দিয়া বদনকে ডাকিতে লাগিল, কেন না নিজে সে ভাল শুনিতে পায় না!

এদিকে স্থিরবুদ্ধি হইলেও সরলা ক্রমে মহা উদ্বিগ্ন হইতেছিল। ঐ কান পান্সী দেখিয়া অবধি তাহার মনে হইতেছিল, আজ রাত্রিটা ভালোয়

ভালোয় যাবে না। আকালের মাকে ভারি ভীত বলিয়া সরলার বরাবর জানা ছিল। তাহার কাছে পান্সীর কথা গোপন না করিলে হিতে বিপরীত ঘটিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এদিকে বেলা পড়িয়া আসিতেছে—সর্দ্দারদিগকে সতর্ক না করিয়া দিলে অবশ্যম্ভাবী বিপদে প্রতিকারের কোনই যে উপায় হইবে না, ইহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য বুড়ী চীৎকারের উপর চীৎকার করিলেও সরলা তাহাকে নিষেধ করে নাই।

বদন যখন আসিল, নৌকা তখন নদীখাতে আসিয়া পড়িয়াছে। উভয় তীরে বনজঙ্গলের আর তেমন বাড়াবাড়ি নাই। আকালের মার পুষ্পাহরণ-সম্পর্কীয় অনুরোধ শেষ হইতে না হইতে বদন দিদিঠাকুরাণীর কাছে পান্সীর খবর শুনিল। সে ব্যস্ত হইয়া আর তিন জনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেল। ইহাতে আকালের মা প্রথমত বিস্মিত পরে ক্ষুব্ধ হইল। নৌকা বাঁধিয়া কেহ ফুল তুলিতে না যাওয়ায় তাহার মনে হইল, সকলে তাহাকে তাচ্ছীল্য করিতেছে। অতএব বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিয়া সে ভাল করে নাই, মনের এই ভাব সে গজগজ করিতে করিতে প্রকাশও করিতেছিল। সরলা হাসিয়া বলিল, "আয়ি, রাগ করিস্ নে। বেলা নেই, পথঘাট ভাল নয়, নৌকা বেঁধে দেরি করলে সন্ধ্যের আগে কোন গাঁয়ে পৌছান যাবে না। কাল ফুল তুলে তোর পাকা চুলে গুঁজে দেব।" ইহাতে বুড়ীর রাগ ভাল হইয়া গেল। সব কথা শুনিতে না পাইলেও "ওঃ তা হবে" বলিয়া সে সরলার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নানা গল্প যুড়িয়া দিল।

দুর্ভাগ্যবশত মাঝিমাল্লা এবং সর্দ্দারদের ভিতর কেহই আর কখন এ পথে আসে নাই। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা অনুভূত হইলে তাহাদের পরস্পরের ভিতর একটা নৈরাশ্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন একটা আশ্রয়স্থান পাওয়া চাই—নহিলে ডাকাইতের দলের মুখে

সেই সাত জন লোক কতক্ষণ দাঁড়াইবে? বাদ্গী চারি জন বুঝিল, সেই "দ্বীপ" বিশে ডাকাতের একটা আস্তানা। কেন না নদীয়া জেলায় অন্য দলপতি তখন ছিল না। দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাহিয়া চলিল। নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ বাবুর নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাহার দিনে যে খ্যাতি প্রতিপত্তি সে সম্ভোগ করিত, সভ্যতর দেশে স্বতঃপূজিত প্রতিভাশালীর পক্ষেও তাহা গৌরবের কথা। বাস্তবিক নিজের অকুতোভয়তা এবং সহৃদয়তা বলে বিশ্বনাথ দস্যু-ব্যবসায়কেও লোকমনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার কৃত লোকহিত এখনও বাঙ্গালার গৃহে গৃহে উল্লাসে কথিত হইয়া থাকে।

অথচ এই বিশে ডাকাত বঙ্গসমাজের অতি নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এ দেশে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিত, তখনকার "মানস্থরে" ও ডাকাতের দল তাহার প্রমাণ। এই ঘোর অরাজকতা, আমাদের বোধ হয়, দুইটি কারণে ঘটিয়াছিল। প্রথম নিম্নশ্রেণীর অতিদারিদ্র্য, দ্বিতীয় তাহাদের উপর উচ্চতর সম্প্রদায়ের অত্যাচার। এ অবস্থায় যে কোন সমাজে কাপুরুষতা এবং দারুণ প্রতিহিংসার ভাব অত্যাচরিতের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলায় ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। এমনও শুনা গিয়াছে, একটিমাত্র রৌপ্যচক্রের লোভে "মানস্থরে" ব্রাহ্মণতনয়কে হত্যা করিয়া দেখিয়াছে, তাহার "গেঁটে"র সে ধন একটি ডবল পয়সা মাত্র, টাকা নহে; এবং তার পর সেই নিহত যজ্ঞোপবীতধারীর বুকে ডবল পয়সাটি রাখিয়া ক্ষুণ্ণমনে সে চলিয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে, নরঘাতী দস্যুপুত্র পিতৃসমক্ষে

অনুশোচনা করিয়াছিল, না জানিয়া চারিটি পয়সার জন্য সে একটা মানুষ মারিয়া ফেলিয়াছে। পিতা প্রবোধ দিয়াছিল, অনেক গুলো মাছ না মারিলে আর চারিটি পয়সা আসে না। একটা প্রাণীর জন্য দুঃখ কি? এই সকল গল্পের মূলে যদি সত্য থাকে, তবে তাহা সমাজ এবং মনুষ্যত্বের কতটা অধঃপাত সূচনা করে ভাবিলে জ্ঞান থাকে না।

বাঙ্গলায় মানুষের সহিত মানুষের যখন এই অহি-নকুল সম্বন্ধ, তখন বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিল। সে এক দিকে ডাকাইতির কাপুরুষতা এবং নিরর্থক অত্যাচার সংযমিত করিয়া দিল, অন্যত্র সে সময়ে যাঁহারা সমাজের নেতা—ধনবান এবং তাঁহাদের আশ্রয়চ্ছায়ায় বর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল—তাঁহাদের যমস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানস্থরের দল প্রায় অন্তর্হিত হইল। ডাকাইতেরা স্ত্রীলোক, বালক, এবং গরিব লোকেদের প্রতি বীরোচিত ক্ষমা এবং দয়া প্রকাশ করিতে শিখিল। এ দিকে দেশের ধনকুবেরগণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের অগাধ ধনের একাংশ বিশ্বনাথ বাবুর অবশ্য-প্রাপ্য। সহজে না দিলে সে বলে লইবে। সেই জন্য বিশ্বনাথের চিঠি পাইয়া যাহারা তাহার দাবি অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিত, বাঙ্গলা মুল্লুকে এমন প্রতাপশালী ব্যক্তি সে কালে দুই চারি জনের বেশী ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথের অনুচরগণের মধ্যে মেঘা এবং বৈদ্যনাথের নামই সুপরিচিত। ইহাদের প্রত্যেকে এক একটা দিক্‌পাল বিশেষ; এবং নির্দ্দিষ্ট দিক রক্ষা করাই তাহাদের মুখ্য কাজ ছিল। সম্প্রতি আমরা বৈদ্যনাথের পরিচয় দিতে বসিয়াছি। নদীয়া জেলার যে দিক্‌টার চিত্র এই ক্ষুদ্র

উপন্যাসে অঙ্কিত হইতেছে, প্রধানত তাহা বিশ্বনাথের ধর্ম্মপুত্র বৈদ্যনাথের অধিকারভুক্ত।

সেই বটচ্ছায়াসংলগ্ন জীর্ণ ইষ্টকালয়ে বৈদ্যনাথ মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিত,—ঘটনার দিনও ছিল। পূর্ব্ব রাত্রে একটা বড় রকমের ডাকাইতি করিয়া সে সদলে শেষরাত্রে প্রায় দশ ক্রোশ ব্যবধানে চূর্ণীনদীতীরস্থ নিবিড় বনে আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানে মুখের কালীচূণ এবং সিন্দূররাগ ধোয়া মোছার পর অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করিয়া ডাকাইত মহাশয়দিগকে দিকে দিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছে। নিতান্ত ভালমানুষটি সাজিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জনপথে বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় বৈদ্যনাথ বাসায় ফিরিয়া আসিল। ক্ষুধাতৃষ্ণার কোনরূপে নিবৃত্তি করিয়া সে নিদ্রা দিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে একখানা সওয়ারি নৌকা তাহার দ্বীপ বেষ্টন করিয়া যায়। গবাক্ষপথে বৈদ্যনাথ দেখিল নৌকায় পাঁচ সাত জন মানুষ, সকলেই দাঁড় বা লগী লইয়া শশব্যস্ত। নৌকার ভিতরকার পর্দ্দাটা একটু একটু দেখা যাইতেছিল। কাজেই বৈদ্যনাথ বুঝিল, দিব্য একটা শীকার আপনা হইতে সিংহের গুহামুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সে সময়ে বৈদ্যনাথ ছাড়া সেখানে দলের আর কেহ ছিল না। কথা ছিল, সে রাত্রে সে সেই আস্তানায় বিশ্রাম করিবে এবং পর দিন দলের লোক সেখানে আসিয়া জুটিলে সকলকে লইয়া দলপতির উদ্দেশে কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাইবে। অতএব বৈদ্যনাথ শুধু স্থিরনেত্রে নৌকার লোকগুলাকে দেখিতে লাগিল। জালে পড়িয়া সিংহ যেমন পলায়নপর মুখের শীকারের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি স্থাপন করে, গোপসন্তান বৈদ্যনাথ তেমনি চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা নদীখাতে ছুটিয়া চলিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন গোয়েন্দা আসিয়া বৈদ্যনাথের নিদ্রাভঙ্গ করিল। সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, দেবীপুরের যে ধনশালিনী

ব্রাহ্মণ-বিধবার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, আজ তাহার কন্যা মাতার ত্যক্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি লইয়া নৌকাপথে শ্বশুরালয়ে চলিয়াছে। ইহাও গোয়েন্দা জানাইল যে, তাহার গন্তব্য স্থান প্রায় তিন দিনের পথ—চূর্ণী এবং গঙ্গা-সঙ্গমের খুব কাছাকাছি।

বৈদ্যনাথ গোয়েন্দাটাকে খুব একচোট কড়কাইয়া লইল। কেন সে ঠিক সময়ে খবর দেয় নাই—তা হলে কি এমন শীকার হাতছাড়া হয়? এই অনুযোগ যে শব্দালঙ্কারপরিহিত হইয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, এ কালের কোন অভিধানে তাহার উল্লেখ নাই। অতএব এ পক্ষ লেখক অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়কে তাহা পাঠরূপ অগ্নিপরীক্ষায় আর ফেলিবেন না। গোয়েন্দা বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া সর্দ্দারকে বুঝাইল যে, সকল দোষ সেই ব্রাহ্মণবালিকার।—"সে বড় শেয়ানা মেয়েমানুষ ধর্ম্মাবতার! যাওয়ার কথা কারু কাছে ভাঙ্গে নি। হঠাৎ আমি শোন্‌লাম। যেমন শোনা তেমনি আসা। কিন্তু এত করেও মনিবের মন পাইনে।"

গোয়েন্দা আত্মনিবেদন করিতে করিতে কাঁদ-কাঁদ হইয়াছিল, কাজেই বৈদ্যনাথ যখন মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এক ছিলিম গাঁজা সাজ দেখি!" তখন সে সহজেই ভাবিল, তাহার কসুর মাফ হইয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে সর্দ্দারের হুকুম তামিল করিয়া গোয়েন্দা অতঃপর বলিয়া উঠিল "হুজুর, বারদিগর বান্দা এমন কসুর আর কর্‌বে না।" বৈদ্যনাথ কোন উত্তর দিল না। সে কি একটা ভাবিতেছিল।

বিশ্বনাথের আদেশমত পর দিন বৈদ্যনাথের সদলবলে তাহার অনুসরণ করিবার কথা এবং সেই বন্দোবস্তই ঠিক্‌ঠাক্ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে সওয়ারি পান্সীখানা একেবারে হাতছাড়া হয়। বিশেষ দেবীপুরের ব্রাহ্মণবিধবার বিস্তর অর্থ ছিল, বৈদ্যনাথ জানিত। দুই একবার লোভপরবশ হইয়া তাহার গৃহলুণ্ঠনের উদ্যোগও করিয়াছিল, কিন্তু দলপতির ভয়ে পারিয়া উঠে নাই। বিশ্বনাথের কাছে একবার এই কথা উঠিলে সে

বলিয়াছিল, "যদি বাপের ব্যাটা হোস্, মরদের সঙ্গে লড়ে টাকা আন্। অনাথা বিধবার টাকার উপর ফের্ লোভ কর্‌বি ত তুই আমার ত্যজ্য পুত্তুর।" কিন্তু উপস্থিত লোভ সংবরণ করা বৈদ্যনাথের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল অতি গোপনে এ কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে, ধর্ম্মবাপ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের হিরণ্ময় কিরণরাশি খড়িয়া নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। পশ্চিমের আকাশে মেঘের উপর মেঘস্তর রবিকরসম্পাতে অপূর্ব্ব বর্ণরাজি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময়ে জগতির ঘাটে এক শুষ্কমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ মহাব্যস্তভাবে আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্রাহ্মণের চরণযুগলে কর্দ্দমের বিশেষ অভাব না থাকিলেও অনেকগুলি কাঁটার ছড় সোজা পথে তাঁহার দ্রুত আগমন সূচিত করিতেছিল। ঠাকুরের বস্ত্র এবং উত্তরীয় অনেকদিন রজকগৃহ দর্শন করে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দেহলগ্ন উপবীতগাছটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না। অতএব পুঁটুলিমাত্র-সম্বল ব্রাহ্মণ ঠাকুর ঘাটে উপস্থিত হইয়া পাটুনিকে দেখিতে না পাওয়ায় যে শাপসম্পাতের কিছুই বাকী রাখিলেন না তাহা বলা বাহুল্য। পাটুনীর বাস্তবিক দোষও যথেষ্ট ছিল। সে ডোঙ্গাখানি পর্য্যন্ত অপর পারে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি কন্যাদায়ে বিব্রত হইয়া অনেক কষ্টে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এই নদীটি পার হইতে পারিলেই ভালোয় ভালোয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী পৌঁছিতে পারেন। নহিলে দস্যুসঙ্কুল দেশে সন্ধ্যার পর কোনও যাত্রীর পরিত্রাণ নাই। ঠাকুর দিনদেবকে পাটে বসিতে দেখিয়া নিজেও সেই নদীতীরে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার মুখের ঘন ঘন দুর্গানাম, এবং নাসারন্ধ্রের দীর্ঘশ্বাসগুলি সান্ধ্য সমীরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

এমন সময়ে একখানা সওয়ারি নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন, মা দুর্গা এ যাত্রা রক্ষা করিলেন। নৌকার ভিতর একটি বাবু গুড়গুড়িতে ধূমপান করিতেছিলেন। ঠাকুর দুই হাতে পৈতা জড়াইয়া তীর হইতে উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে নদী পার করিয়া দেওয়া হোক্!

ব্রাহ্মণের তখনকার আকার প্রকার কতকটা হাস্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝিমাল্লাদের কেহ হাসিয়া বলিল, "বিট্‌লে বামুনের রকম দেখ। খেয়ার নৌকা পেলে আর কি!"

বাবুটি ঠাকুরকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিলেন। প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অত তাড়াতাড়ি ওপারে যেতে ব্যস্ত কেন ঠাকুর? বসুন, তামাক ইচ্ছা করুন।"

মাল্লাদের এক জন ব্রাহ্মণের হুঁকায় জল পূরিয়া ঠাকুরের হাতে দিল। এতক্ষণ ঠাকুরের মুহূর্ত্তমাত্র শত বৎসর বোধ হইতেছিল, কিন্তু তাম্রকুটের সুরভি ধূম তাঁহাকে বলিয়া দিল, বাবুটো আমীর গোছের বটে। চাইলে কোন্ দু চার টাকা না দেবে! কাজেই কোমরের পুঁটুলিটি একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি তামাকু সেবনে মন দিলেন।

ততক্ষণ নৌকারোহী, সেই শুষ্কমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের আপাদমস্তক দেখিয়া লইতেছিলেন। তামাক খাওয়ার সময় ঠাকুরের কথা কহার অবসর ছিল না। অতএব ধূমপান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নৌকারোহীও কিছু বলিলেন না।

হুঁকা ছাড়িয়া ঠাকুর বলিলেন, "বাবু মশায়কে খুব আমীর বলে বিবেচনা হয়। আমরা আপনাদিকে সতত আশীর্ব্বাদ করে থাকি। কন্যাদায়ে পড়ে কথঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েচে, এখনও বিস্তর বাকী। কিন্তু বিশে

ডাকাতের ভয়ে যা কিছু পেয়েচি, তাই নিয়ে আমায় বাড়ী ফির্‌তে হয়েচে। আজ সন্ধ্যার আগে পৌঁছিতে না পারলে ব্যাটার কোন লোকের হাতে প্রাণ যাবে! এই যে পাটনীটে দিন থাক্‌তে ওপারে নৌকো বেঁধে পালিয়েচে, সে হয় ত বিশে ডাকাতেরই লোক। কি তার মতলব আছে কে জানে!"

বাবুটি আয়ত চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, বিশে ডাকাত তোমার মত কন্যাভারগ্রস্তের টাকা নিয়েছে, কখন এমন শুনেচো কি?"

ঠাকুর। আর বাবা, সে ব্যাটার আবার সে সব-বোধ আছে। জাত বাগ্দী, বামুনের মর্য্যাদা সে বুঝ্‌বে কি? সেদিন শুনলাম, ত্রিবেণীর তর্ক-পঞ্চাননের উপর ভারি জুলুম করেচে। ভদ্রলোক সেজে গিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "দেবতা, কৃপণের ধনে কার্ অধিকার?" তর্কপঞ্চানন কি অত ছাই জানেন, তিনি শাস্তর আউড়ে দিলেন। আর যাবে কোথা! ব্যাটা বলে কি, "তস্করেরও যদি অধিকার, তবে মশায়ের মত কৃপণের ধনে আমার অধিকার আছে।" তর্কপঞ্চানন কি করেন, সুড় সুড় করে পাঁচটি হাজার টাকা গুণে দিলেন!

নৌকারোহী উচ্চ হাস্য করিলেন, বলিলেন, "দেবতা, তর্কপঞ্চানন কোম্পানির বেতন খান, তিনি আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কিসে? অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু কখন একটি কাঙ্গালী ভোজন করান না। আর বিশে ডাকাত মূর্খ বাগ্দীর ছেলে হলেও কত অপৈতকের পৈতা দিয়ে থায়, কত কন্যাদায়গ্রস্তের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েচে, কত অনাথা বিধবার ভরণ-পোষণ করে, তা তুমি জান না ঠাকুর!"

ঠাকুর। কথায় বলে, গোরু মেরে বামুনকে দান। অমন দানের মুখের ছাই, আর যে বামুনের ছেলে অমন ডাকাতির টাকা গ্রহণ করে, তার মুখেও ছাই! বল্‌বো কি মশাই গো, এম্‌নি দিন কাল পড়েচে যে,

টাকার জোরে ডাকাত বিশে বাগ্দীও বিশ্বনাথ বাবু হয়ে দাঁড়াল। কোম্পানি বাহাদুর হুকুম দিয়েচেন, যে তাকে ধরিয়ে দিতে পার্‌বে, সে দশহাজার টাকা পুরস্কার পাবে। কিন্তু ব্যাটার কেমন জোর কপাল, আর ফিচলিমি বুদ্ধি, কেউ তাকে ধরিয়ে দিতে চায় না।

শ্রোতা বলিলেন, "ঠাকুর, বিশে ডাকাতকে অত গাল দিলে, সে শুন্‌লে তোমার কি ভাল হবে?"

ঠাকুর চকিত দৃষ্টিতে নৌকার ভিতর বাহির একবার দেখিয়া লইলেন। মাঝিমাল্লারা বাহিরে বসিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। ঠাকুরের এতক্ষণে সন্দেহ হইল, এই লোকগুলো যদি বিশে ডাকাতের সংস্পৃষ্ট হয়! তাঁহার শুষ্কমুখ আরও শুকাইয়া উঠিল। কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবু, লোকে অসাক্ষাতে রাজার মাকে ডান বলে। আমি সামান্য ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার নিন্দায় কি এসে যায়? আমি আপনাকে কথার কথা একটা বল্‌ছিলাম, আর কি। বুঝলেন কি না?"

নৌকারোহী হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর যাকে গাল দিলে সে তোমার সামনে বসে! আমি বিশে ডাকাত! কি আছে তোমার পুঁটুলিতে?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে মুহূর্ত্তে সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও ব্রাহ্মণ ঠাকুর অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। বিশ্বনাথের মূর্ত্তিতে ভীতিব্যঞ্জক কিছুই ছিল না। তাহার নাতিদীর্ঘ কৃষ্ণদেহে লাবণ্য উছলিয়া পড়িতেছিল। আকর্ণায়ত চক্ষু যুগলে অনন্যসাধারণ একটা জ্যোতি থাকিলেও তাহা কঠোরতামাত্রশূন্য। দেখিলে মনে হয় না এই ব্যক্তি হীন তস্করমাত্র। ব্রাহ্মণ প্রথম দর্শনে তাহাকে এক জন সদ্বংশজাত এবং জমীদার গোছের লোক ভাবিয়াছিলেন, দস্যুদলের নায়ক বিশ্বনাথ বাগ্দী বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন

না। প্রকাশ্যে বলিলেন, "বাবু, তুমি বিশ্বনাথ হও আর যেই হও, আমি তোমার হাতে পড়েছি। কোনও কথা তোমার কাছে লুকাই নাই। দয়া করে আমায় যদি পার করে দাও, প্রাণ ভোরে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই!"

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল, "দেবতা, এখনও আপনকার বিশ্বাস হয় নি যে, সত্যসত্যই আমি বিশে ডাকাত। বুঝতেই পারবেন, কেড়েকুড়ে নেওয়া আমার ব্যবসা। আপনাকে পার করে দেব বটে, কিন্তু পুঁটুলিটি নৌকায় রেখে যেতে হয়েছে ঠাকুর। এতদিন ডাকাতিই করেছি, পাটুনি গিরি কখন করি নি! পুঁটুলিটি খেয়ার কড়ি বলে দিয়ে যান।"

ব্রাহ্মণ নিরুপায়— লোকটা তবে বিশে ডাকাতই বটে! যথাসর্ব্বস্ব যায় যাক্, প্রাণটা বাঁচিলে আবার ভিক্ষা মিলিবে। ঠাকুর পুঁটুলিটি খুলিয়া বিশ্বনাথের সম্মুখে রাখিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, গরিব বামুনের যা কিছু আছে নাও। না জেনে তোমায় অনেক কটু কথা বলেচি। কিছু মনে করো না! এখন আমায় পার করে দাও।"

বিশ্বনাথ। ঠাকুর কতগুলি টাকা সংগ্রহ করেছ? কন্যাদায়ে উদ্ধার হতে কত টাকা তোমার চাই?

ঠাকুর। শ' দুই টাকা পেয়েছিলাম বাবা, আরও শ' দুইয়ের যোগাড় কর্‌তে পার্‌লে তবে এ যাত্রা উদ্ধার হতাম কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? তুমি হুকুম করে দাও বাবা আমি পার হয়ে যাই।

বিশ্ব। ঠাকুর, অত ব্যস্ত হবেন না। আজ রাত্রে দয়া করে এই নৌকোয় বাস করুন। প্রাতে বাড়ী যাবেন। অধম বাগ্দীর দান নিতে যদি ঘৃণা না করেন, পাঁচ শ' টাকা কাল প্রণামী দেব।

ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইলেন। বলিলেন, "তুমি বিশ্বনাথ বাবুই বটে। শাপভ্রষ্ট হয়ে বাগ্দীকুলে জন্মেছ। দস্যুব্যবসায়ী হলেও তোমার মত মহৎ এ কালে দেখা যায় না। বাবা, কত লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে আজ তিন মাস ধরে দু' শ' টাকা সংগ্রহ করেছি, আর একেবারে তুমি পাঁচ শ

টাকা আপনা থেকে দিতে রাজি হলে! কিন্তু অত টাকার আমার দরকার নেই বাবা। যদি দয়া কর্‌লে, তবে গরিব ব্রাহ্মণের পুঁটুলিটি ফিরিয়ে দাও, আর তোমার লোক দাও, আমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসুক।"

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল। "বুঝেছি ঠাকুর, ডাকাতকে যে এতটা বাড়ালে সে কেবল পাপের টাকাটা না নেবার জন্যে। আচ্ছা, আমার ডাকাতির টাকা নিতেই দোষ, ভিক্ষা করে যদি আপনাকে প্রণামী দিই, তাতে ত দোষ নেই? আমি একখানি চিঠি দিচ্চি। আপনি নিজে না যান, কাউকে দিয়ে চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেই রাজবাড়ী থেকে পাঁচ শ' টাকা আস্‌বে।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মাল্লা-বেশধারী কেহ এক জন প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। বিশ্বনাথ বাক্স খুলিয়া মসীপাত্র এবং লেখনী সংগ্রহ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। এমন সময়ে অপর পার হইতে কেহ শিস দিল। মাঝি হাঁকিল, "বৈদ্যনাথের লোক।"

"আচ্ছা, নৌকা পারে নাও," বলিয়া বিশ্বনাথ চিঠি লিখিতে লাগিল। ব্রাহ্মণকে বলিল, "ঠাকুর, ছেলেবেলায় পাঠশালায় দিনকতক লিখেছিলাম, তাই চিঠিখানা, পত্রখানা লিখতে পারি। কিন্তু ভাল পারিনে। তা' মা কালীর প্রসাদে এতেই কাজ চলে যাচ্চে।"

নৌকা ভিড়িতে না ভিড়িতে চিঠি লেখা সম্পূর্ণ হইল। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণের হাতে পত্র দিয়া তাহার পদধূলি লইল এবং বিনীতভাবে বলিল, "ঠাকুর, অপরাধ নেবেন না। নিজের অনেক বড়াই করেছি, কিছু মনে কর্‌বেন না। এ অধম বাগ্দীকে যখন ইচ্ছা মনে কর্‌বেন, প্রসাদ খেয়ে আস্‌ব। গরীব দুঃখীকে বলে দেবেন, দরকার হলে আমার কাছে যেন আসে। আমি সবারই মিত্র—কেবল জুলুমবাজের শত্রু। কোম্পানি বাহাদুর শুন্‌চি আমার মাথাটা নেবার জন্যে হুলিয়া করেচে, কিন্তু মা কালী জানেন, বিশে বাগ্দী হতে কোম্পানির কোন ক্ষতি আজ পর্য্যন্ত হয় নি।

কিন্তু সাহেব গুলো কি না, বেনের জাত বড়মানুষের টাকাগুলো গরিবের ঘুরে যায়, এটা ওরা সইতে পারচে না। ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করে যেও, বিশে যেন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবা করতে করতে মরতে পারে।”

ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে কতকটা নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, “বাবা, লোকে বলে বিশ্বনাথ বাবু, আমি বলি রাজা বিশ্বনাথ। মা কালী তোমার প্রতি প্রসন্ন, তোমার আবার ভয় কি ?”

ঠাকুর বিদায় হইয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিদায় হইয়া গেলে বৈদ্যনাথের লোক নৌকায় আসিল। লোকটা বৈদ্যনাথের সেই গোয়েন্দা, সমস্ত রাত্রি এবং দিন চলিয়া আসিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আর কখন তাহাকে সংবাদ বহন করিয়া দূরান্তরে যাইতে হয় নাই। পথকষ্টে এবং সময়ে পৌছিতে না পারিলে কপালে কি আছে ভাবিয়া সে মনে মনে “কসম” লইয়াছিল আর কখন এমন ঝক্‌মারি করিবে না। সমস্ত পথ সে বৈদ্যনাথের মুখের কথাগুলি মুখস্থ করিতে করিতে আসিয়াছিল। অতএব বিশ্বনাথের সম্মুখে নীত হইবামাত্র গোয়েন্দা হানিফ সেখ পড়া পাখীর মত বলিয়া চলিল যে, অমুক দিন অমুক জায়গায় ডাকাইতি করার পর বৈদ্যনাথ বাবুর ভারী অসুখ করিয়াছে। সম্প্রতি দু’ এক দিন চলিতে ফিরিতে সে অসমর্থ যদি ভাল থাকে, তিন দিন পরে আসিয়া দলপতির সঙ্গে দেখা করিবে। ইত্যাদি।

সহজেই বিশ্বনাথ বুঝিল, লোকটা নির্জ্জলা মিছা বলিতেছে, প্রথমত

কিছু না বলিয়া সে তীক্ষ্ণ কটাক্ষে সেখজীর আপাদমস্তক দেখিয়া ... আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিয়া বলিল, "সেখের পো, আইন আদালতে মিছে চলে, আমার যে কাজ তাতে চলে না। আসল কথাটা কি বল শুনি। তোমার দোষ কি? ব্যাটা ভেমো গোয়ালা যা শিখিয়ে দিয়েচে, তাই তুমি বল্‌চো বই ত নয়। আঁটকুড়োর পুতের বিশ্বাস, বুদ্ধিতে সে একটা মুচ্ছুদ্দি, কিন্তু তার মত বোকা ভূভারতে নেই। কোন্ দিন কি বিপদে পড়ে, তাকে নিয়ে আমার এই ভাবনা। লোভিষ্টি ব্যাটা বুঝি কোন লোভে পড়েচে—তাই অসুখের ওছিলা? ঠিক্ ঠিক্ বল শুনি।"

হানিফ সেখ ঠিক্ ঠিকই বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা বৈদ্যনাথের দীর্ঘ গুম্ফ এবং আরক্ত চক্ষু যুগল তাহার মনে পড়িয়া গেল। তার উপর বৈদ্যনাথ আসিবার সময় বলিয়াছিল, "খবরদার, আসল কথা সর্দ্দার টের না পায়," সে কথা হানিফ একবারও ভোলে নাই। সে দুইবার ঢোক গিলিয়া বলিল, "না হুজুর, মিছে কথা কেন হবে? ভারি ব্যামো, এবার রক্ষা পান কি না। আপুনি হচ্ছো দুনিয়ার মালিক, নেমক খেয়ে কি মিছে বল্‌তে পারি ধর্ম্মাবতার!"

"কই হায়রে" বলিয়া বিশ্বনাথ হাঁকিল। শান্ত সিংহ সহসা উত্যক্ত হইয়া যেমন গর্জ্জন করিয়া উঠে, এ তেমনি তীব্র ক্রোধব্যঞ্জক স্বর। শুনিয়া নৌকা সহিত আরোহিবর্গ কাঁপিয়া উঠিল। সন্ধ্যা-তিমিরে নদীহৃদয় কম্পিত করিয়া সে পরুষ কণ্ঠ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। মাঝি মাল্লারা নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে না করিতে নদীতীরে শত সশস্ত্র দীর্ঘাকার পুরুষমূর্তি যুগপৎ সারি দিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ ধরিত্রী যেন দ্বিধাবিভিন্ন হইয়া নিশাচর প্রেতগণকে দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন।

দলপতি বলিল, "এই মিথ্যাবাদীটেকে একবার কেউ সিধা করে আন্‌ত। পঞ্চাশ পয়জার গুণে মার্‌বি। তাতেও যদি সত্যি না বলে, ওর মাথাটা খড়ের জলে কেটে ফেলে দে।"

কিন্তু তাহার দরকার হইল না। হানিফ দলপতির বিকট কণ্ঠ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল, হুকুম শুনিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। তার পর সকল কথা খুলিয়া বলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুনিয়া বিশ্বনাথ মেঘাকে কাছে ডাকিল। দস্যুতায় মেঘা তাহার দক্ষিণ হস্ত, কিন্তু মুসলমান বলিয়া সে একটু তফাৎ তফাৎ থাকিত। দলপতির হুহুঙ্কারে আর সকলেরই আসন টলিয়াছিল—কেবল মেঘার টলে নাই। সে কাপড় মুড়ি দিয়া তখন মাঝির কাছে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল।

বিশ্বনাথ বলিল মেঘু, বদে ব্যাটার আক্কেলের কথাগুলো শুন্‌লি ত? সামান্যি টাকায় যার এত লোভ, আমার মনে হয় কিছুই তার অসাধ্যি নেই। আমার মাঝে মাঝে এমনও ভাবনা হয় যে, ভোর বাঙ্গলা মুল্লুকের লোক কোম্পানির হুলিয়ায় ভুলে আমার অনিষ্ট কর্‌তে রাজি হবে না, কিন্তু ঐ গোয়ালাটা লোভ সামলাতে পারবে না। ধর্ম্মবাপ ব'লে সে আমায় রেয়াৎ কর্‌বে না।"

মেঘা অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। বিশ্বনাথ আবার বলিল, "এখন হাঁস্‌চিস্, কিন্তু আমি বল্‌চি বোদে থেকে আমার দলের এক দিন সর্ব্বনাশ হবে। দেবীপুরের সেই অনাথা ব্রাহ্মণবিধবার টাকার ওপর ব্যাটার অনেক দিন থেকে নজর, কেবল আমার ভয়ে এত দিন পেরে ওঠেনি। এখন নাকি বিধবাটা মরে গেছে, আর তার মেয়ে টাকা কড়ি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে; লোভিষ্টিটে এ সুবিধে আর ছাড়্‌তে পার্‌লে না। এত যার লোভ, তার কখন কোন ধর্ম্মজ্ঞান নেই। কিন্তু আমি তার ফন্দী

খাট্‌তে দেব না মেঘু। তোকে বল্‌চি, বিশে যদি বাপের ছেলে হয়, বদে ব্যাটার এ ফন্দী অবিশ্যি ফেঁসে যাবে। আমি এখনই চল্লাম। তুই আমার "রণ্‌পা" * দুখানা এনে দে। বিশ কোশ রাস্তা বইত নয়। এখনও সন্ধ্যার আমল। দেড় প্রহর রাতে আমি পৌঁছে যাব।"

মেঘা বলিল, "যেতে দাও। এর পর কোন শাস্তি দিও! টাকা-গুলো না হয় বামুনের মেয়েকে ফিরে দিও। কুড়ি কোশ তুমি দেড় পহরের ভেতর মারবে বটে, কিন্তু একলা গিয়ে যদিই কোন বিপদে পড়? তা ছাড়া আজ্‌কের উদ্যোগ সব পণ্ড হবে।"

বিশ্বনাথ হাসিল। "মেঘু, তোরা যখন কেউ ছিলিনে, তখন প্রথম বয়সে এক দিন এক তরওয়ালে পাঁচ শ' লোকের মোহড়া নিয়ে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে ফিরেছিলাম। তখন এত কল কৌশল জান্‌তাম না—লোকের বল, টাকার বল, নামের বল ছিল না। আর আজ একটা অনাথা বামুনের মেয়েকে একা বাঁচাতে গিয়ে বিপদে পড়ব? না মেঘু, আমি যাবই যাব। আমি বেঁচে থাক্‌তে দলের লোকে এমন অধর্ম্ম কর্‌লে মা কালী অপ্রসন্ন হবেন। আমি কোথায় চল্লাম, কাউকে বলিস্ নে। আমার রণ্‌পা জোড়া এনে দে। আজ্‌কের অন্য কাজ তুই কর্!"

মেঘা দলপতিকে ভাল করিয়া চিনিত। দেখিল, কথা বলিতে বলিতে বিশ্বনাথ বারম্বার দন্ততলে অধরোষ্ঠ স্থাপিত করিল। তাহার ললাটতটে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষুতে অসাধারণ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছিল। মেঘা আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

তখন মেঘাকে কিছু দূর সঙ্গে লইয়া গিয়া সময়োচিত উপদেশ দিয়া, সশস্ত্র বিশ্বনাথ যুগল বংশখণ্ডে লাফাইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

---

* রণপা—ডাকাইতদের দ্রুতগমন জন্য লাঠি-বিশেষ। লাঠির মূলদেশ হইতে কিছু দূর উর্দ্ধে পর্য্যন্ত পা রাখিবার স্থান থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে প্রথম রাত্রিটা সরলার একরূপ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় দিন, মধ্যাহ্ণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্নানাহারের জন্য মাঝি মাল্লারা গোবরডাঙ্গার হাটের নীচে নৌকা বাঁধিল। হাটের দিন নহে, তেমন গোলমাল ছিল না। দুই চারি জন মাত্র দোকানী সেখানে সচরাচর বাস করে। জলখাবার কিনিবার জন্য বদন এক দোকানে গেল। মুদী ভগবান মদক তখন চশমাচক্ষে অবহিত মনে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল। অশোক বনে চেড়ীরা মা জানকীকে যে সব কষ্ট দিয়াছিল, ভগবান রামায়ণের সেই স্থানটা পড়িতেছিল এবং পড়িতে পড়িতে ভাবভরে অশ্রুপাত করিতেছিল। তাহার গলায় তুলসীর ঘনবিন্যস্ত মালা, ললাটে এবং বক্ষে হরিনামের ছাপ।

বদন বাগ্দী দেখিল দোকানী সব জিনিস রাখে, আর তার গলার সুরে পড়া শুনিতেও বেশ লাগিতেছিল। কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি সে হাঁকিল, "দু' পয়সার মুড়ি মুড়কি দাও গো দোকানী মোশাই। তার পর পড়ো।"

ভগবান হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, একটু অপেক্ষা কর। কিন্তু বদনের ক্ষুধার জ্বালার উপর তাড়াতাড়ি ছিল। সে বলিল, "অনেক দূর যেতে হবে গো দোকানী মোশাই, তাতে মেয়ে ছেলের সওয়ারি নৌকা। একটু শীগ্গীর অবদান কর।"

মদক চশমা খুলিয়া চক্ষু মুছিল। বদনের কাছে পয়সা লইল বটে, কিন্তু ডবল দামের জিনিস দিল। তার পর সুধাইল, "কোথায় যাবে, কোথা হইতে আসিতেছ?"

ডাকাতির ভয় বদনের মনে জাগিতেছিল। মুদীটের হরিনামের ছাপ

আর রামায়ণ পাঠে তার উপর একটু ভক্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া কিছু সন্দেহ হইল। বিশেষ বদন শুনিয়াছিল, অনেক ডাকাইত ছদ্মবেশে পথিকের কাছে সংবাদ সংগ্রহ করে। বদন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দোকানীর দিকে চাহিল এবং ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল।

বুঝিয়া ভগবান হাসিল। বলিল, "সন্দেহ হয়, উত্তর দিও না। কিন্তু সাবধান, ডাকাতের গোয়েন্দা তোমাদের পিছু নিয়েচে। পালাও, আর দেরি করো না।"

বদন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া নৌকায় গেল, এবং মাঝি মাল্লা ও অনুচরদের খবর দিল। তাহাতে সেই সাত জন পুরুষের অতি অনুচ্চ কণ্ঠে যে পরামর্শ চলিতেছিল, সহজেই তাহা সরলার শ্রুতিপথে প্রবেশ করিতেছিল। বরং সেই সপ্ত-মন্ত্রীর মন্ত্রণামধ্যে মতভেদের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, সপ্তকণ্ঠের যুগপৎ ফুস্ ফুস্ রব যখন মিলিত হইতেছিল, তখন সরলা আশঙ্কা করিতেছিল, হাটের নীচে বুঝি হাট জমিয়া যায়।

সরলা বদনকে ডাকিয়া তিরস্কার করিল, কেন প্রথমে তাহাকে সংবাদ না দিয়া সাতটা ভূতে হট্টগোল করিতেছে? তখন দিদি ঠাকুরাণীর আদেশমতে বদন সংবাদদাতাকে ডাকিতে গেল।

ভগবান বলিল "বাপু, আমার দোকানে তুমি যদি একটু থাক, আমি তোমার নৌকায় যেতে পারি। আমার কেউ নেই, কেবল একটা মা-মরা ন' বছরের মেয়ে। তা সেটা কোথা খেলতে গিয়েচে। সে যদি এখন আসে, আমায় না দেখে কেঁদে গোল করবে। বলো, তোর বাপ মরেনি।" হাসিয়া ভগবান সওয়ারি নৌকার উদ্দেশে ধাবিত হইল।

ভগবান মদকের সঙ্গে সরলার যে কথাবার্ত্তা হইল, এখানে তাহার কোন কথা আমরা বলিব না। তারপর সকলে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইল বটে, কিন্তু আহার বড় কিছু হইল না। অবিলম্বে নৌকা গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সরলার নৌকা পরিহারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। গ্রাম সেখান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র। নদীতীর হইতে মৃণ্ময় গৃহগুলির মাঝে একটি ইষ্টকালয়ের চীলের ঘর এবং দুইটি শিবমন্দিরের উন্নত চূড়া দেখা যাইতেছিল। গ্রামপ্রান্তে দীঘির উচ্চ পাড়ে নিবিড় বটগাছের বিস্তৃত শাখা প্রশাখা এবং ঘন তালগাছের সারি।

দেরি মাত্র না করিয়া সরলা গ্রামাভিমুখে চলিল। অনুচরদের সঙ্গে পূর্ব্বেই পরামর্শ স্থির হইয়াছিল, ঘাটে নৌকার চিহ্ন মাত্র রাখা হইবে না। ইহাতে মাঝি মাল্লাদের লাভ; কাজেই তাহারা সম্মত হইয়াছিল "ছই" খুলিয়া নৌকাখানি ঘাট হইতে দূরে জলমগ্ন করিয়া রাখিবে। শ্রবণ-শক্তির অপ্রাথর্য্য গুণে আকালের মা ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই। গুণে, কেন না আগে হইতে শুনিতে বুঝিতে পারিলে বুড়ী পথে নিশ্চয়ই গণ্ডগোল বাধাইত।

অতএব জিনিসপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া সরলাকে প্রস্তুত হইতে দেখিয়া, বুড়ী জঠরজ্বালা ভুলিয়া গেল। সমস্ত পথ সে "সলিকে" বুঝাইতে বুঝা-ইতে আসিতেছিল যে, মুড়িমুড়কি খেয়ে দিন কাটানর দিন কাল তাহার গিয়াছে। তাহার বয়সে সময়ে দুটো ভাত নহিলে "মহাপ্রাণী" ক'দিন টিকিবে? তা সে ভাত শাক ভাতই হোক্, কি নুন ভাতই হোক্! অসহ্য হইলে সরলা একবার কেবল বলিয়াছিল—"আয়ি বুড়ী, বুড়ো হয়ে তুই একেবারে বায়াত্তরে গিয়েছিস্—ছি! পুরুষগুলো শুনে ভাব্বে, সব মেয়ে বুঝি তোরই মতন পেটুক!"

ঘাটে নৌকা লাগিলে বুড়ী নাতিনীকে লইয়া একটু রঙ্গ রসে প্রবৃত্ত হইল। সে ভাবিয়াছিল, এই তাহাদের গন্তব্য স্থান—খবর পাইলে নাত-

জামাই পালকী বেহারা সঙ্গে নিজে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বুড়ী বলিল, "সলি, তোর পালকীর সঙ্গে আমি ত ভাই ছুটে যেতে পারব না। আমার হয়ে নাতজামাই না হয় যাবে। কিন্তু বর পেয়ে আয়ি বুড়ীকে ভুলে থাকিস্‌নে যেন। একমুটো ভাতের যোগাড় করে রাখিস্!"

কিন্তু বুড়ীর আশা ভরসার মূল সহসা শুকাইয়া উঠিল। তাহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও বদন নাতজামাইকে খবর দিতে গেল না। সরলা দ্রুতপদে এবং হাঁটিয়া শ্বশুরবাড়ী চলিল দেখিয়া সে তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। দুঃখিত হইয়া বলিল—"এমন অলক্ষণ করো না। ভাদ্দর মাসে বেরিয়েচো, তার ওপর এমন বেহায়ার মতন গেলে লোকনিন্দার সীমা থাক্‌বে না। চিরকালের জন্যে নাতজামায়ের বিষনয়নে পড়্‌বে!" কিছুতে বুড়ী ছাড়ে না দেখিয়া সরলা বুড়ীর কাণে কাণে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল, "ডাকাত পাছু নিয়েচে, দেরী করিস্‌নে!"

বুড়ী তখন আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। দুই চারি পা চলিতে না চলিতে সে সভয়ে একবার চারিদিক দেখিয়া লইতেছিল এবং দূরে কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হইলেই বলিতেছিল—"ঐ গো শেষে মান্‌সুরের হাতে প্রাণ গেল!"

নৌকার ব্যবস্থা করিতে মাঝি মাল্লা এবং পাইকদের যে সময় গেল, তাহার মধ্যেই আয়ি বুড়ী সরলাকে লইয়া গ্রামে পৌছিল। সেখানে গিয়া কি করিতে হইবে না হইবে, পথে সরলা বুড়ীকে শিখাইতে শিখাইতে গিয়াছিল। ভগবান মদক বলিয়া দিয়াছিল, "মা, পরিহারের বিক্রম সিংহের আশ্রয় নিও, কোন ভয় থাকিবে না।" কিন্তু কিছুতে বুড়ী সে নাম মনে রাখিতে পারিতেছিল না।

গ্রামে প্রবেশ করিতে না করিতে এক দল স্ত্রীলোকের সঙ্গে সরলা-দের দেখা হইল। আকালের মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"বলি, মা

ঠাকরুণরা আপনারা বল্‌তে পার, এই গাঁয়ে কে সিংহী বাবু আছে ? তার নামটিও যেন বাঘ বাঘ, বুড়ো মানুষ, ছাই মনে থাকে না।”

অনেক গুলি যুবতী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সরলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল— “বাবু বিক্রম সিং তাঁর নাম।” সে মুখশ্রী এবং সুকণ্ঠে একটা মোহিনী ছিল। বুড়ীর কথা শুনিয়া যিনি হাস্য করেন নাই, তিনি বলিলেন, “চল মা, আমাদের বাড়ী চল!” সরলা দেখিল তিনি বিধবা, কক্ষে পূর্ণ পিত্তলকুম্ভ। কে এক জন বলিয়া দিল, “ইঁহারই বাপের নাম বক্রম সিং।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কন্যার মুখে শরণাগতা ব্রাহ্মণকন্যার বিপদের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বিক্রম সিংহ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। চাকরী করিতে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙ্গলা দেশে প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার আর্দ্র বায়ু এবং মৃত্তিকায় আজিও এই রাজপুতবংশকে তেমন কাবু করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ নিজের গোলাবাড়ী হইতে পুত্রদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। খবর আসিল, দুই প্রহরের পর শীকারে গিয়া এখনও তাহারা ফিরিয়া আসে নাই। শুনিয়া বিক্রম সিংহ হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, বহুত রোজ সে হাম্ ভি শীকার নেহি খেলা, আজ্ রাতকো মালুম হোগা, বুড্ঢা বিক্রম সিং একেলে অ্যাভি কেৎনা শীকার খেল্‌নে শকৃতা হায়।”

কন্যা মীরা বলিল, “বাবুজি, শীকার খেল্‌তে গিয়ে মাঝে মাঝে তারা রাত্রে আসে না। যদিও আসে, সেও অনেক রাত্রে। তাদের কাছে লোক পাঠাও। যদিই ডাকাত আসে।” মীরা হিন্দী বেশ বুঝত বটে, কিন্তু ভাল বলিতে পারিত না। বাঙ্গলা তার মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছিল।

বিক্রম হাসিয়া উঠিলেন। সরলাকে কাছে ডাকাইয়া নিজে সকল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুঝিলেন পশ্চাদ্গামী ডাকাতেরা বিশ্বনাথের দলের লোক। ইহাতে তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ডাকাত গুলো বিশে বাগ্দীর দলেরই বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় দলপতি এর কিছু জানে না। তাকে আমি যত দূর জানি, সে এক জন প্রকৃত বীরপুরুষ। অনাথ স্ত্রীলোককে কাপুরুষের মত আক্রমণ কর্‌বার লোক সে নয়।" তখন বিক্রম নিজের সঙ্গে প্রথম বয়সে বিশ্বনাথের যে ভাবে এক দিন সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহার গল্প করিলেন :—

মেহেরপুরের মল্লিক বাবুদের বাড়ী বিক্রম সিং তখন জমাদার। বিশ্বনাথ এক দিন চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, বাবুরা তাহার নিকট তিন দিনের মধ্যে দুই হাজার টাকা না পাঠাইলে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবে। আম্‌লা মুৎসুদ্দিরা বাবুদের পরামর্শ দিলেন, টাকাটা দেওয়াই শ্রেয়, নহিলে বিশ্বনাথ সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে। বিক্রম সিং ইহা সহিতে পারিল না। বাবুদিগকে জানাইল, বিশে ডাকাতের কাছে টাকা পাঠাইবার আগে তাহাকে চাকরী হইতে জবাব দেওয়া হোক্। শেষে বাবুরা তাহার কথায় টাকা পাঠাইতে নিরস্ত হইলেন। দুই দিনের ভিতর বিক্রম ডাকাত তাড়াইবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিল। তিন দিনের দিন সন্ধ্যার সময় খবর আসিল, বিশ্বনাথ ভৈরব নদীর অপর তীরে সদলবলে ছাউনি করিয়াছে।

নিঃশব্দে, বিনা অস্ত্র সম্বলে বিক্রম সিং নদী পার হইয়া ডাকাত-শিবিরে দর্শন দিল। দুই জন খেলোয়াড় বিশ্বনাথের ছাউনি সম্মুখে "ঘাটি" রক্ষা করিতেছিল—চন্দ্রালোকে তাহাদের ঘূর্ণ্যমাণ অসিফলক জ্বলিতেছিল। বিক্রম তাহাদের কথার উত্তর দেয় না দেখিয়া, তাহারা তাহাকে সর্দ্দারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল।

বিশ্বনাথ চক্ষু ভরিয়া বিক্রমের দীর্ঘমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। বলিল, "দেখার জিনিস বটে! কি চাও তুমি?"

বিক্রম বলিল, "আমি বাবুদের নিমক খাই। কি সাহসে তুমি তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়াছিলে? কি সাহসে এখানে আসিয়া ছাউনি করেছ? আমি নিরস্ত্র; সাধ্য থাকে, আমার সঙ্গে আগে লড়, তার পর মনিববাড়ীমুখো হইও।"

বিশ্বনাথের প্রশংসমান চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "হাঁ তুমি বীর বটে। এ বাঙ্গলা দেশে এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ বিশেকে বলে নি। কিন্তু শুধু কথায় হবে না। একটু কাজে দেখাও দেখি। আকাশে ঐ টিটি পাখী ডাক্‌চে। এই নাও ধেনুক আর বাঁটুল। তীর চাও ত তাও দিতে পারি। পাখীটেকে পেড়ে আন ত দেখি।"

বাস্তবিক তখন স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকতলে, বিশ্বনাথের শিবিরের মাথার উপর টিট্টিভ পক্ষী ডাকিয়া যাইতেছিল। এই পাখীর ডাকটা তেমন শুভসূচক নহে বলিয়া একটু আগে বিশ্বনাথ তাহাকে একবার লক্ষ্য করিয়াছিল' কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই। বিক্রম সিং ধনুক এবং বাঁটুল লইল— বলিল, "ঐ পাখী গুলো অনেক দূরে দূরে উড়ে বটে, কিন্তু তীরের বোধ হয় দরকার হবে না।" এই সময়ে পাখীটা আবার ছাউনি শীর্ষে ঘুরিয়া আসিল। নিমিষে বিক্রম উহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া শরাসনে টঙ্কার দিল! মৃতপক্ষী বিশ্বনাথের পদতলে আসিয়া পড়িল। সেই হইতে আর কখনও বিশ্বনাথ মেহেরপুর অঞ্চলে কোনও উদ্যম করে নাই।

এই কথার পর বিক্রম কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বেটি! আজ আমার সুপ্রভাত, তাই ব্রাহ্মণকন্যার পদধূলি আমার বাড়ীতে পড়েচে। তুই যথাসাধ্য ওঁর সৎকার কর্। ওঁর লোক জনকে সিধা পাঠিয়ে দে। কোন ভাবনা করিস্ নে। চাকরদের বলে দিস্, আমার সানা * আর তরওয়ালখানা ঠিক্ করে রাখে। যদিই শীকার খেল্‌তে হয়।"

* সানা—বর্ম্ম বিশেষ। উহার সঙ্গে নানা অস্ত্র সংযুক্ত থাকে। শুনিতে পাই, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে আজও পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মীরা রাজপুত্নী বাপের বড় আদরের মেয়ে—কেন না, সে আজন্ম দুঃখিনী। সূতিকাগৃহে জননী সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে স্বামি-হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। তার পর অনেক কষ্টে মানুষ করিয়া পিতা দ্বাদশ বর্ষে সুপাত্রে তাহার পরিণয় বিধান করিলেন বটে, কিন্তু অদৃষ্টে সহিল না। ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে মীরা বিধবা হইল। বিক্রম সিংহ পূর্ব্বে চাকরী করিতেন। এই সর্ব্বনাশের পর তাহা ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন।

বিক্রম তৎপূর্ব্বেই পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইল। তার পর আট বৎসরের মধ্যে চারি পুত্র উপহার দিয়া দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীও তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিমাতার জীবিতকালে মীরা ভাইগুলিকে সস্নেহে লালন পালন করিত। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহাদের সকল ভার তাহার উপর পড়িল।

কন্যার কল্যাণে বিক্রম প্রৌঢ় বয়সে সন্তানপালনের ক্লেশ ও উদ্বেগ হইতে অনেক পরিমাণে পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু চারিটি ছেলের ভবিষ্যতের দিকে তখন হইতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার পৈতৃক জমীদারি অতি সামান্য—পরিহার এবং তাহার সন্নিহিত মল্লিকপুর নামে গ্রাম। দুই খানি গ্রামের বার্ষিক আয় হাজার টাকার বেশী নহে। কিন্তু বিস্তর জমী অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াছিল। কর্ত্তারা সকলেই পুরাতন মনিব সরকারের চাকরী করিতেন, নিজ জোতগুলি পর্য্যন্ত ভাগে দেওয়া হইত। কর্ম্মত্যাগের কিছু কাল পরে ধনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিক্রম স্বয়ং খাসে চাস সুরু করিলেন। কয় বৎসরের ভিতর পতিত জমী আবাদ হইয়া গেল।

যে গোলাবাড়ীতে তাঁহার ছেলেরা সচরাচর থাকিত, তাহা বিক্রম সিংহের নিজের কৃত। বিস্তর শস্য সেখানে সঞ্চিত হইয়াছিল। ইদানীং বিক্রম বিস্তৃত ভাবে মহাজনীও করিতেন। পীতাম্বর, দিগম্বর এবং যোগাম্বর, এ সকলের তত্ত্বাবধারণ করিত। কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ম্বর এখনও বালক। সে গ্রামের পাঠশালায় পড়িত, সন্ধ্যার পর বাপের কাছে "ভজন" শিখিত।

মীরা বলিত, "বাবুজী, পীতু, দিগুর বিয়ে আর না দিলে চলে না, যোগুর বিয়ে না হয় দু বছর পরে দিও। পাড়ার বাড়ী বাড়ী বউদের দেখে আমার সাধ হয়, আমার ভাইদের বউ এলে সাধ আহ্লাদ করি।" বুড়া হাসিল। "বেটী, বাঙ্গলা মুলুকে থেকে থেকে তোরও মেজাজ্ বাঙ্গালীর মতন হয়েচে। এখন লেড়কাগুলোর বিয়ে দিয়ে শেষে ওদের আখের খাব। আরও পাঁচ দশ বছর যেতে দে বেটী।" ইহাতেও মীরা জেদ করিলে পিতা সাশ্রুনয়নে বলিতেন, "মা! বাবুদের কথা শুনে বার বছর বয়সে তোর বিয়ে দিলাম। কি তাতে ভাল হলো বল্? আমার মনে হয়, কেন তোকে অত কম বয়সে বিবাহ দিয়ে চিরদুঃখিনী করেছি।"

বড় আদরের মেয়ে বলিয়া মীরা অতিশয় পিতৃভক্ত হইলেও দু এক বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইতে বাধ্য হইত। বিক্রম ছেলেদের খবর দিয়া আনাইবার প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইলেন বটে, কিন্তু মীরা তাহাতে কান দিল না। সে বুঝিল, ডাকাইতরা সত্য সত্য আসিলে বৃদ্ধের ভূতপূর্ব্ব বাহুবল-গৌরবে কুলাইয়া উঠিবে না। অতএব মীরা ভাইদের ডাকিতে লোক পাঠাইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ।

গৃহস্থালীর সকল কাজ সারিয়া মীরা সরলার কাছে আসিয়া বসিল। বিক্রম সিংহের তখন অর্দ্ধ রাত্রি এবং সরলার আয়ি বুড়ি তাহার নিকটে শুইয়া নাসিকাগর্জ্জনে বৃহৎ অট্টালিকার নিশীথ-নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

সরলা তখনও শয়ন করে নাই। মীরার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া শেষে আপনার পরিণাম চিন্তা করিতেছিল। আগে যে সব কথা আদৌ মনে হয় নাই, তখন তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার বোধ হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, ডাকাইতের হাত থেকে যদিই রক্ষা পাই, তার পর কপালে কি আছে কে জানে? স্বামি-গৃহে যাইবার আগে একবার তাঁহার কাছে খবর পাঠাইয়া অনুমতি চাহিলে বুঝি ভাল হইত। শ্বশুরালয় কিরূপ সপত্নীরা কে কেমন লোক, কে কে সেখানে বাস করেন, এ সকলের কোনও সম্বাদ সরলা কখন রাখে নাই। যদি গিয়া দেখে,—স্বামী প্রবাসে গিয়াছেন এবং সপত্নীরা কণ্টক ভাবিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন কোথায় দাঁড়াইবে? আর স্বামী গৃহে থাকিলেই যে সহসা তাহাকে আশ্রয় দিবেন, তাই বা কে বলিল? এর আগে এ সব নিরাশার কথা ঘুণাক্ষরেও সরলার মনে উদয় হয় নাই; কেন না, পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে সে জানিত না, সত্য সত্যই মানুষের সংসারটা শ্বাপদজন্তুসঙ্কুল ঘোর অরণ্যের মত।

এই ভাবনার তন্ময়তাবশত সরলা মীরাকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই। মীরা হাসিয়া বলিল, "বোন্, এখনও তুমি শোও নাই! ভাবনা কি, তোমার শ্বশুরবাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়। কালই সোয়ামীর কাছে পাঠিয়ে দেব।"

সরলা লজ্জিত হইল। অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা নয় দিদি,

আমি ভাবচি কি যে, আমি এসে আজ বুঝি তোমার খাটুনি আরও বেড়েচে। রোজ সংসারের এত কাজ তুমি কি করে কর? ধন্যি তুমি দিদি।"

মীরা হাসিল। "বোন্, কাজই আমার সব। তুমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্চ, সুবচুনী করুন অনেকগুলি ছেলে পুলে হোক্, সোণার সংসার পাতিয়ে তুমি সারাদিন কাজে কর্ম্মে নাইতে খেতে অবসর না পাও। আমি ভাই কাজকেই বিয়ে করেছি—সোয়ামী কেমন ছিলেন মনেও পড়ে না। আশীর্ব্বাদ কর, কাজ কর্‌তে কর্‌তেই যেন মরি। যেন বাপ ভাইদের সাম্‌নে পুড়তে পুড়তে ছাই হ'য়ে যাই।"

মীরার সেই হাসিটুকুর ভিতর একটা করুণার আর্দ্র ভাব ছিল; সে হাসি এবং কথা সুরসংযুক্ত কবিতার মত শ্রোতার প্রাণ আকুল করিয়া যেন বলিতেছিল—এ নারীজন্মের কোন সাধ আমার পূরিল না!

চোখের জল মুছিয়া সরলা বলিল, "দিদি, মারও আমার বেশী বয়েস হয় নি, তোমার চেয়ে তিনি কিছু বড় ছিলেন। তিনি বল্‌তেন 'পুড়লো মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।' তোমরা বিপদ কাটিয়ে উঠ্‌লে, তবু তোমাদের এখনও ভাবনা। আমি ত সুমুদ্দুরে ভাস্‌চি, মা দুর্গার মনে কি আছে কে জানে।"

মীরা সস্নেহে বালিকার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল "সরলা, আপনাকে যে রক্ষা কর্‌তে জানে না, স্বয়ং ভগবানও তাকে রক্ষা করেন না। এ মেয়েজন্মের প্রধান ভূষণ লজ্জা আর কলঙ্কের ভয়। যার তা আছে, তার কোনও ভয় নেই। বিধবা মীরার কথা ক'টি মনে রেখো বোন। আজ বিশ বছর এই মন্তর জপ করে কাটাচ্চি।"

এই সময়ে সহসা গ্রামপ্রান্তে বিকট চীৎকার শুনা গেল। সরলা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মীরা স্থির ভাবে বলিল, "এ ডাকাতের কুল্‌কুলি।* ডাকাত

* কুলকুলি—ডাকাইতেরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমত "হারে রে রে" ইত্যাকার বিকট চীৎকার করে, তারই নাম।

এসে পড়লো কিন্তু ভাইদের এখনও দেখা নেই। বুড়ো বাপকে বাঁচান আজ ভার হবে।

এই বলিয়া মীরা গৃহান্তর হইতে দুই খানি শাণিত তরবারি লইয়া আসিল। সরলা বলিল, "তুমি এ হাতিয়ার নিয়ে কি করবে দিদি? ভাইরে এলেও যা হোক্।"

সে বিপদের মুহূর্ত্তেও মীরা পূর্ব্ববৎ হাসিল। "এখুনি তোমায় বলেচি বোন, নিজের রক্ষার ভার নিজের হাতে। আমরা রাজপুতের মেয়ে। তুমি কি শোন নি, ম্লেচ্ছদের হাত থেকে চিতোরে সতীরা কি করে উদ্ধার হত?"

সরলা আসন্ন বিপদ ভয়ে এবং ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "আপদ কালে সবাই মরতে জানে দিদি! তোমার কথায় আমার পাঁচ হাত বুক হলো।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরিহারের রজপুত বাবুদের বাড়ীতে কখনও ডাকাইতি হয় নাই বটে, কিন্তু তখনকার দিনে হইবার কোনও আটক ছিল না। মীরা বুঝিয়াছিল, এতদিন দলপতি খাতির করিয়া আসিলেও, তাহার দলস্থ লুব্ধেরা সরলার পলায়ন ওছিলায় আজিকার রাত্রে সম্ভবত পিতার ধন গৌরব যশ পরীক্ষা করিতে ছাড়িবে না। অতএব মীরার আদেশে পাইক দু'জন সশস্ত্র এবং সজাগ রহিল। বাহিরের ছাদের উপরে তাহারা লোষ্ট্ররাশি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল। বন্দুক সব শীকারে চলিয়া গিয়াছিল। যে দুইটা জীর্ণ মরিচা-পড়া অস্ত্রাগারে পাওয়া গেল, তাহা তাহারা সাফ ও প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

কুল্‌কুলির কোলাহল উঠিতে না উঠিতে বৃদ্ধ বিক্রম সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভৃত্যেরা তাঁহার বর্ম্ম এবং অস্ত্রাদি যথাস্থানে ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিল, সজ্জিত হইতে দেরি মাত্র হইল না। অতএব মীরা পিতার শয়নকক্ষে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি সদর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পাইকেরা তখন ভাল করিয়া দ্বাররক্ষার উপায় বিধান করিতেছিল।

দেখিয়া বিক্রম সিং চটিয়া আগুণ হইলেন। বলিলেন, "তোরা কি মনে করিস্, আমি জেনানার মত দরওয়াজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করব? খুলে দে। তোরা দু জনে ছুটে গিয়ে দু ধার থেকে দেখে আয়, শালে ডাকু লোক কোনও রাইয়তের ওপর জুলুম কর্‌চে কি না।"

কিন্তু পাইকেরা বাহির হইতে না হইতে ডাকাতদের দল তীব্রবেগে প্রবেশ আসিয়া পড়িল। চক্ষের নিমিষে সুশিক্ষিত সেনাবৎ তাহারা দলপতির নির্দ্দিষ্ট আপন আপন স্থান অধিকার করিল। ঘাটি-রক্ষকদ্বয় দ্বারসম্মুখবর্ত্তী সমস্ত স্থানটুকু চকিতে পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছিল। মেঘকক্ষে সৌদামিনীবৎ তাহাদের হস্তধৃত তীক্ষ্ণধার অসিফলক সর্ব্বত্র চমকিতেছিল। সে অস্ত্রসঞ্চালন-নিপুণতা দেখিতে দেখিতে বিক্রম সিং উল্লসিত হইলেন। স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন— "বাহাবা খেলোয়াড়!"

যে চারি জন ডাকাইত দরওয়াজার মধ্যে প্রবেশের জন্য ছিল, বৈদ্যনাথ তাহাদের সর্ব্বাগ্রে। সে বিশ্বনাথের মুখে অনেকবার বিক্রম সিংহের প্রশংসা শুনিয়াছিল। উন্মুক্ত প্রবেশদ্বারপথে বর্ম্মাবৃত বৃদ্ধকে দেখিয়া বৈদ্যনাথ প্রমাদ গণিতেছিল। সহসা অগ্রসর হইতে ইতস্তত করিতেছিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বিকৃতকণ্ঠে বিক্রমকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আমরা আপনকার বাড়ীতে ডাকাইতি করতে আসি নি। একটা মেয়েমানুষ টাকা কড়ি নিয়ে পালিয়ে এসে আপনকার বাড়ীতে লুকিয়ে আছে। তাকে বাড়ী থেকে বার করে দিন্। আমরা তাকে পেলেই চলে যাব।"

বিক্রম সিং হাসিলেন। সে হাস্য ঘৃণায় বিদ্রূপে পরিপূর্ণ! বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম তোরা বিশ্বনাথের লোক। সেটা ভুল। বীরের দলে বীর থাকে। তোরা নীচ মানস্থরে মাত্র। একটা স্ত্রীলোক এসে তোদের ভয়ে আমার আশ্রয় নিয়েচে। তোরা ভেবেছিস্, লুটতরাজের ভয়ে বুড়ো বিক্রম সিং আশ্রিতকে তোদের হাতে ছেড়ে দেবে। ধিক্! বিক্রম সিংহের বংশে ছোট একটা মেয়ে অবশেষ থাকৃতে তা হবে না। আয়, যদি মরদ বাচ্ছা হোস্, একে একে আমার সঙ্গে লড়্।"

তখন বিক্রম সিং সেই সঞ্চালিত অসির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঘাটির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘাটি-রক্ষকদ্বয় মুহূর্ত্তের জন্য অস্ত্র-ক্রীড়া বন্ধ করিল। কিন্তু বৈদ্যনাথের তীব্র তিরস্কারে আবার পূর্ব্ববৎ তাহারা খেলিয়া ফিরিতে লাগিল।

এই অবকাশে বৈদ্যনাথের ইঙ্গিতে দুইজন ডাকাইত দ্বারমুখে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু পলকে প্রতিহত হইয়া পিছু হটিয়া আসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মীরা পিতার প্রত্যেক গতি লক্ষ্য করিয়া মহা উদ্বিগ্ন হইতেছিল। বিপদে নির্ভীকতা বশত অনেক সময় তিনি চারি দিক না সামলাইয়া কাজ করিয়া থাকেন, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। বিক্রম সিং মুক্তদ্বাররক্ষার কোনও উপায় বিধান না করিয়া সহসা পথে অবতীর্ণ হওয়ায় মীরা প্রমাদ গণিল, এবং অবিলম্বে নিজে পাইক দু জনকে পার্শ্বে রাখিয়া অসিহস্তে দ্বাররোধ করিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে পাইকদ্বয়কে দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু শাণিতঅসিধারিণী, মুক্তকশী, গৌরাঙ্গিনী মীরা দেবীমূর্ত্তিবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছিল। দেখিয়া বেগগামী ডাকাইত দুইটার গতিরোধ হইল।

তাহারা বিস্মিত হইরা থমকিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে পাইকদের হস্ত-নিক্ষিপ্ত সড়কীদ্বয় যুগপৎ তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল। উভয়েই বেগে পিছু হটিয়া আসিল। একজন গুরুতর আহত হইয়াছিল, সে ঘাটির পথে পড়িয়া গেল।

বৈদ্যনাথ দলের লোককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হুঁসিয়ার, মাছি লেগেছে।" * বিক্রম সিংহের দিকে ফিরিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "ভেবেছিলাম তুমি বড় বীর, কিন্তু বাড়ীর ভেতর লোক লুকিয়ে রেখে সবাই অমন বীরত্ব করিতে পারে। আজ আমি তোমার বাড়ী ডাকাতি করতে আসিনি, তাই বেশী লোক সঙ্গে নেই। আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত। আর এক দিন দেখা যাবে।" বিক্রমও ডাকাইতটার পতনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ধ্রুব জানিতেন, তাঁহার বিনা আদেশে বাটীর কেহ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না। অতএব বৈদ্যনাথের মত তিনিও বিত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া দ্বারপথে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে ধৃতাস্ত্র আলুলায়িতকুন্তলা কন্যামূর্ত্তি,—অন্ধকারে ভৃত্যদ্বয়কে দেখা যাইতেছিল না। বৃদ্ধ বিক্রম হাসিয়া উঠিলেন। পশ্চাতে ফিরিয়া বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই তোরা জওয়ান? একটা বালিকার অস্ত্রের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারলি নে?" মীরা পিতাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্দর-পথে পলাইল। বৈদ্যনাথ অনতিপরে বিক্রম সিংহের পাছে পাছে আসিয়াছিল,—সে ইহা দেখিতে পাইল।

তখন সেই দরওয়াজার নীচে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বৈদ্যনাথ ঘাটিরক্ষকদের ডাকিয়া বলিল, "তোরা খুব হুঁসিয়ার থাক্, আর সব্বাইকে ভেতরে পাঠিয়ে দে।" ছয় জন তখন বেগে আসিয়া চারি দিক হইতে

* মাছি লেগেছে—ডাকাইতদের সঙ্কেতবাক্য। ইহাতে বুঝায়, আমরা আর নিরাপদ নহি, লোক জন আমাদের অনুসরণ করিতেছে।

বিক্রম সিংকে আক্রমণ করিল। পাইক দুই জন প্রভুকে রক্ষা করিতে গেল বটে, কিন্তু আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইল। তখন তাহারা অন্দর-পথে পলায়ন করিল।

একাকী বিক্রম সিং সেই বৃষতুল্য বলবান ছয় জন জওয়ানের সঙ্গে লড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্ভুত অস্ত্রচালনার কৌশলে প্রায় প্রতিক্ষেপে শত্রুরা আহত হইলেও দুই দণ্ডের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর বুঝা গেল, ক্রমে তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। ডাকাইতদের মশালে বাটী আলোকাকীর্ণ হইয়াছিল,—মীরা এবং সরলা অন্দরের দ্বারপথে থাকিয়া সকলই দেখিতেছিল। পিতার সে সঙ্কটাবস্থা বুঝিতে পারিয়া মীরা সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বোন্, মরিবার সময় উপস্থিত। লজ্জা কিসের? বাবুজীকে দেখে লজ্জায় পালিয়ে গেলাম, তাই এ বিপদ ঘট্‌ল। আর লজ্জার সময় নেই। আমি বাবুজীকে বাঁচাবার চেষ্টা দেখব। তুমি যেন ডাকাতের হাতে না পড়,—আশীর্ব্বাদ করি মর্‌তে পারবে।"

ততক্ষণে বিক্রম সিং অতিরিক্ত শ্রম জন্য অবসন্ন হইতেছিলেন,—মীরা পশ্চাতে আসিতে না আসিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন কন্যা সকল ভুলিয়া পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

সরলার এক হস্তে তরবারি, অন্য হস্তে ক্ষুদ্র বেতের পেটরায় নিজের সর্ব্বস্ব। সেই পেটরা ডাকাতদের সম্মুখে রাখিয়া সরলা বলিল,—"আমার যা কিছু আছে, সব তোমরা নাও। কিন্তু আমায় ছুঁয়ো না। যিনি আজ আশ্রয় দিয়ে বাপের কাজ করেচেন, তাঁর একটু সেবা করতে দাও। তোমাদের যদি মা বোন থাকে, তা মনে কর। আমায় ছুঁয়ো না।"

এই মুহূর্ত্তে দূরে অশ্বপদধ্বনিবৎ কিসের শব্দ শোনা গেল। ডাকাইতেরা সভয়ে শুনিল, রণ্‌পায় কেহ অতি দ্রুত ধাবিত হইতেছে।

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এইখানে একটু পিছাইয়া গিয়া আমরা বিশ্বনাথের অনুসরণ করিব।

রণ্‌পা সহায়ে বিশ্বনাথ সচরাচর সুদক্ষ অশ্বারোহীর মত অতি অল্প সময়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিত। শোনা যায়, ডাকাইত-সঙ্কুল প্রদেশে এখনও সেই দ্রুতযানের চলন সম্পূর্ণ নিবারিত হয় নাই। নহিলে সিপাহী সাহেবেরা রোঁদে বাহির হইলে যে "দাগী বদ্‌মায়েস্‌কে" গৃহে হাজির পাইয়া থাকেন, সেই আবার তিন চারি ঘণ্টার অবসরে দশ ক্রোশ দূরে ডাকাইতি করিয়া প্রাতে আপনার শয়নকক্ষে দিব্য ভালমানুষটির মত নিদ্রা দেয়, এ রহস্যের অর্থ কি? ফলত কদন্নভোজী, নামমাত্র মৎস্যাহারী বাগ্দী, বা গোঁড়-গোয়ালা-জাতীয় জওয়ানেরা এখনও যে সুশাসিত বাঙ্গালার বুকে বসিয়া অসাধ্য-সাধন করিয়া থাকে, এর একটা নৈসর্গিক কারণ আছেই আছে।

ঘোরান্ধকারে, আন্দাজে মাঠের সোজা পথ ধরিয়া, বিশ্বনাথ চূর্ণী নদীর গতি অনুসরণ করিয়া চলিল। সেই ভরা ভাদ্রের জলে ভরা ধান্য ক্ষেত্রে এবং পঙ্কিল "আইল্‌"পথের পার্শ্বদেশ হইতে অবিশ্রান্ত ঝিল্লিরব উঠিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আকাশে মেঘের সঞ্চার ছিল না। মাঝে মাঝে প্রান্তরে ইতস্তত সঞ্চিত বর্ষাজলে, নক্ষত্রসনাথ নভোমণ্ডল ছায়া হিল্লোলে ঈষৎ কাঁপিতেছিল। ক্বচিৎ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে প্রবাহিত জলের করুণ কল্লোল ধ্বনিত হইতেছিল। কোথাও গ্রামপ্রান্তে নিবিড় বটচ্ছায়ার ছেদশূন্য অন্ধকার মধ্যে পেচকদম্পতি বিকট চীৎকার

করিতেছিল। নিশীথের এই রুদ্র গাম্ভীর্য্য বাস্তবিক অনন্তের বিরাট মূর্ত্তি প্রকটিত করে।

অবলীলাক্রমে বিশ্বনাথ এইরূপ ভয়ানক দৃশ্যাবলী পশ্চাতে রাখিয়া স্থিরলক্ষ্য শ্যেনপক্ষীর মত দ্রুত ধাবিত হইতেছিল। ক্রমে কূলে কূলে প্লাবিত চূর্ণীর খরপ্রবাহশব্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ বুঝিল, বৈদ্যনাথের আশ্রয়স্থান অদূরে। এমন সময়ে সহসা মাথার উপরে উড্ডীয়মান টিট্টিভ পক্ষী নিনাদ করিয়া উঠিল। সে রব উদাসীনের দূরাগত সঙ্গীতবৎ বিশ্বনাথের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া বিশ্বনাথ মনশ্চক্ষে প্রথম জীবনের একমাত্র পরাজয়-দিন অঙ্কিত দেখিতে পাইল। চন্দ্রকরপ্রফুল্ল ভৈরবনদীসৈকতে দণ্ডায়মান বিক্রম সিংহের দীর্ঘ মূর্ত্তি বহুদিন পরে সহসা চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিল না, এই ঘটনায় হৃদয় তাহার কম্পিত হইল কেন? ইচ্ছা ছিল, তীরে একটু অপেক্ষা করিয়া "আস্তানার" সংবাদ লইবে, কিন্তু তাহাতে আর প্রবৃত্তি হইল না। অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে বিশ্বনাথ নদীবক্ষ লক্ষ্য করিতে করিতে চলিল। কোথাও কিছু নাই—নৌকার চিহ্নমাত্র নাই। শেষে বিশ্বনাথ গোবরডাঙ্গার হাটে আসিয়া পৌঁছিল।

রাত্রি গভীর হইয়াছিল—দ্বিপ্রহরের আর বড় দেরি ছিল না। দোকান পাট সব বন্ধ—কাহারও সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কেবল ভগবান মদকের দোকানের ঝাঁপ তখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। ক্ষীণ প্রদীপালোকসম্মুখে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় সে মধুরকণ্ঠে কীর্ত্তনের সুরে গাহিতেছিল,—

"পাপ এত মনোহর করে কেন গড়েছিলে।
বিষবল্লরী কেন আপাতরম্য কুসুম-ভূষণে সাজাইলে।
এত ঋজু যদি পাপ-পথ কেন হৃদয়ে বল না দিলে।
এই অসম দ্বন্দে, জীববৃন্দে, পরীক্ষা কর কি ছলে।"

নিঃশব্দে রণ্পা রাখিয়া বিশ্বনাথ দোকানে প্রবেশ করিল। কিন্তু দীপ-ছায়ায় ধরা পড়িল। ভগবান শয়ন বন্ধ করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি বাবা, এই মাত্তর এলে না কি?" বিশ্বনাথ বিস্মিত হইয়া সুধাইল—"আমি আস্‌ব, তুমি জান্‌লে কেমন করে বাবা?" ভগবান হাসিল। "সংসারে এখন ভাবি কেবল হরিনাম, আর বিশে বাগ্দীর রূপ। আগে থাকৃতে মন জান্‌তে পার্‌বে, এ আর বেশী কথা কি বাপু?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান তখন বিশ্বনাথের পরিচর্য্যায় রত হইল। তাহাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইল, এবং সম্মুখে প্রচুর মিষ্টান্ন ও ঘটিতে জল রাখিয়া দিল। বিশ্বনাথ বলিল, "ও সব এখন থাক্। আমি তোমার এখানে এসেছি কেবল একটা খবরের জন্য। নইলে আমার এখন এক তিল দেরি করার সময় নেই। একখানা সওয়ারী নৌকা এই নদীতে ভেটেল মুখে গেছে, তার কোন খবর রাখ কি না? বদে ব্যাটার হালচাল কিছু বল্‌তে পার কি না?"

ভগবান বলিল, "বাপু! উপস্থিত ত্যাগ করতে নেই। আগে একটু জলযোগ করে নাও, সব [illegible] হাসিল। বলিল, [illegible] নি। কিন্তু জল একটু না খেলে নয়।" তখন ভগবান স্বহস্তে [illegible] ও শীগ্‌গির [illegible] ান্ন বিশ্বনাথকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইল। অ[illegible] থ। তে[illegible] গুরুতর আহার করিল;—কেন না হাত তুলিতে উদ্যত হইলেই [illegible] ন কুটুম্বিনীর মত কখন পরিহাস, কখনও স্নেহপূর্ণ শপথ বা গালির উ[illegible]স খুলিয়া দিতেছিল।

জলযোগের পর ভগবান আবার তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

বিশ্বনাথ একটু কুপিত হইয়া বলিল, "ভগবান, এতক্ষণ যে ঘোড়ার মতন ছুটে এলাম, সেটা কি কেবল তোমার নেমন্তন্ন খেতে? যখন তুমি বাপু বৈষ্ণবের ভেক্ ধরে থাক্‌তে, তখন তোমার কিছু আক্কেল ছিল। আসল বৈষ্ণব হবার যোগাড় করে তুমি একেবারে বয়ে যেতে বসেছো। ডাকাতি করতে আসিনি, সে ভয় করো না। তা হ'লে তোমার ফাঁদে পা দিতাম না।"

ভগবান বিশ্বনাথের হাতে কলিকা দিয়া বলিল,—"যে জন্যে তুমি এসেছ, তা আমি জানি; খানিকটে মন জানতে পারে, খানিকটে জেনে নিতে হয়। বদের লোক তোমার কাছে গেল, সে খবর যখন পেলাম, তখনই বুঝলাম, বাপধন আমার যদি ঠিকানায় থাকেন, তবে একবার দেখা দিতে আসবেনই আস্‌বেন। তা না হলে বাপু এই চাষার হাতে তুই হঠাৎ এসে মেঠাই জেলাপি রসগোল্লা টাট্‌কা টাট্‌কা খেলি কেমন করে? এত বুদ্ধি ধরিস্, এটুকু বুঝ্‌তে পার্‌লিনে বাপু। হাজার হোক জেতে বাগ্দী তার কত হবে বল?"

বিশ্বনাথ হাসিল। "তুই বাপু জেতের বড়াই নিয়েই গেলি। তবু যদি এই বাগ্দীর ছেলে না হতিস্। কিন্তু আজ গানটা বড় গাচ্ছিলি সরেস। আসল কথাটা বলে ফ্যাল্ শীগ্‌গির, যদি কোন বিশি ব্যবস্থা করে থাকিস্ ত বল্—আমি তা হলে নড়িনে। তোর গান শুনে রাত কাটাই।"

তখন ভগবান যাহা জানিতও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়া বিশ্বনাথ কহিল, "বিক্রম সিংহের আশ্রয়ে বামুনের শ্বে সে মধুরকণ্ঠের তুমি যেমন নিশ্চিন্ত হয়েচো, আমিও তেমনি হতে পারব করে কেন্তু তবু মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌চে। তোমার মুখে সিংহাতাশয়ের নাম শুনে আমার গায়ে বাপু কাঁটা দিয়েছিল।" বিশ্বনাথ পথিমধ্যে টিট্টিভ পক্ষীর রব শুনিয়া যে ভাবে বিচলিত হইয়াছিল, সে গল্প করিল। তখন বিক্রম সিংহের কোন

অমঙ্গলসূচনায় উভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ আবার বলিল, "এর পর আর দেরি করা ভাল হয় না। বদে ব্যাটার ত কাণ্ডজ্ঞান নেই, দরকার বুঝ্‌লে বুড়ো মানুষটাকে অপমান ত কর্‌বেই, মেরে ফেল্‌তেও আটক নেই। তুই বাপু আমার সঙ্গে চল্‌। পথে তোর গানটা শুন্‌তে শুন্‌তে ফির্‌ব। কবে শিখ্‌লি, কই সেদিন ত এটা গাসনি? সে দিন বাসুদেব ঘোষের গান গেয়েছিলি—

"জীবের দুঃখ দেখে মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীব-পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥

চল্‌ পাঁচ কোশ্‌ রাস্তা বই ত নয়—লহমায় যাব, লহমায় আস্‌ব! তোর রণ্‌পা জোড়া বার্‌ কর্‌।"

ভগবান। "আমাকে আর এ সবে জড়াস্‌ কেন বাপু। ও পথে আর নয়। তোর অনুরোধে দোকানের ঠাট্‌ করে এমন জায়গায় আছি, যেথানে কথা কইবার একটা লোক পাইনে। নূতন গান সেদিন শিখেছি, একটি রাহী বাবাজীর কাছে। নবদ্বীপে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে হবে। এখনও সুরটো ঠিক কায়দা হয় নি। তোকে বাপু কতবার মিনতি করচি, তুই নবদ্বীপে আমায় থাক্‌তে নাই দিলি, ওপারে স্বরূপগঞ্জে তোর আড্ডার কাছাকাছিই না হয় রাখ। এত লোককে এত দয়া করিস্‌, বুড়ো বাপের এ অনুরোধটুকু রাখতে পারিস্‌নে!"

বিশ্বনাথ দোকানের চারি দিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল—শেষের কথা ক'টা শুনিয়া একমুখ হাসিল। বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে! কোম্পানি যে রকম বাদে লেগেছে, আমাকেও শীগ্‌গির সেই জায়গায় যেতে হবে দেখচি! এখন বাপু বাজে কথা রাখ। তোর রণ্‌পা জোড়া কই?—দেখচিনে যে! লক্ষ্মী বাপ্‌ আমার চল্‌, লহমায় যাব, লহমায় আস্‌ব।"

ভগবান্‌। তোর রণ্‌পা ফন্‌পা আমি কি আর কিছু রেখেছি বিশু—

তুই একলা যা! ফিরে এসে গান শুনিস্। আমি জেগেই থাক্‌ব। মেয়েটা যদি জেগে ওঠে, তাকে থামাবে কে? তুই একলা যা বিশু!"

বিশু তাহা শুনিল না। ত্রস্তহস্তে দা লইয়া আপনার সুদীর্ঘ রণ্‌পার * প্রথমার্দ্ধ কাটিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে দুই জোড়া রণ্‌পা প্রস্তুত হইল। তখন বিশ্বনাথ ভগবানকে টানিয়া এক জোড়ায় দাঁড় করাইল। নিজে তাহার দোকানের ঝাঁপ বাঁধিয়া স্বয়ং আর এক জোড়ায় লাফাইয়া উঠিল। তার পর দুই জনে পাশাপাশি বন্য ঘোটকযুগলের মত তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই সন্নিহিত রণ্‌পা-শব্দ আসন্ন শত্রুর তূর্য্যনিনাদবৎ বৈদ্যনাথের কর্ণে ধ্বনিত হইল। সকলের আগে সে বুঝিল, আগন্তুক আর কেহ নহে—বিশ্বনাথ স্বয়ং। বুঝিল, সে অবস্থায় দলপতির সম্মুখে পড়িলে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। মুহূর্ত্তে মনঃস্থির করিয়া বৈদ্যনাথ হাঁকিল—"গুড়াও।" † তখন সেই ক্ষুদ্র দস্যুসেনা নিমেষে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সড়কীতে যে গুরুতর আহত হইয়াছিল, তাহার গতিশক্তি ছিল না। স্বহস্তে বৈদ্যনাথ সেই আহত মুমূর্ষুর শিরশ্ছেদ করিল, এবং এক জনকে আদেশ করিল, ছিন্নমুণ্ড আমূল তরবারি-বিদ্ধ করিয়া লয়!

---

* রণ্‌পার নীচে এবং উপরে অনেক স্থানেই পা রাখিবার স্থান থাকে। অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব গতিতে যাইবার জন্য ডাকাতরা নীচের দিকটা ব্যবহার করে। অত্যন্ত দ্রুত গমনের জন্য উপরে পা রাখিবার দরকার হয়।

† অর্থাৎ, গুটাও বা জাল উঠাও। সর্দ্দারের এই সঙ্কেতবাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র ডাকাইত দলে, যে যে অবস্থায় থাক, পলায়ন করে।

নিজে সরলার সেই বেতের ক্ষুদ্র পেটরাটি উঠাইয়া লইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা রণ্‌পার শব্দের বিপরীত দিকে ঘোরান্ধকার-মধ্যে অন্ত-র্হিত হইল।

অনতিপরেই বিশ্বনাথ ভগবান সঙ্গে ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ হইল। বিক্রম-সিংহের গৃহসম্মুখে দস্যুদের নিক্ষিপ্ত মশালের ভগ্নাংশ সকল তখনও অল্প-বিস্তর আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেরা সজাগ হইয়াছে বটে, কিন্তু সাহস করিয়া ঘটনাস্থলে আসিতে পারিতেছে না। সদ্যোহৃত-শির কবন্ধ-মূর্ত্তি রুধিরাপ্লুত হইয়া পথিমধ্যে ভয়ানক দেখাইতেছিল। প্রথমত উভয়ের আশঙ্কা হইয়াছিল, হয় ত স্বয়ং বিক্রম সিংহ দস্যুহস্তে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। সবিশেষ জানিবার জন্য উভয়ে সেই মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিল। দেখিল, যোদ্ধৃবেশে বৃদ্ধ বিক্রম সিং অঙ্গনমধ্যে পড়িয়া আছেন। মুক্তকুন্তলা বিধবা আপন অঙ্কে মস্তক রাখিয়া সযত্নে তাহাতে জলসেক করিতেছেন। আর পার্শ্বে বসিয়া কিশোরী বালিকা চোকের জল মুছিতে মুছিতে অঞ্চল দোলাইয়া তাঁহাকে বায়ু বীজন করিতেছে, এবং তাঁহার পরিহিত বর্ম্মবন্ধন শিথিল করিবার প্রয়াস পাইতেছে কিন্তু পারিতেছে না।

ত্রস্তহস্তে বিশ্বনাথ সেই ভূপতিত বীরের দীর্ঘ দেহ বর্ম্মচ্যুত করিয়া ফেলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিক্রম সিং একেবারে অজ্ঞান হন নাই। অর্দ্ধজাগ্রতবস্থায় সকল কথা শুনিতে বুঝিতে পারিতেছিলেন। প্রায় চারি দণ্ডের শুশ্রূষার পর তাঁহার

দৌর্ব্বল্য কিছু পরিমাণে দূর হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি বিশ্বনাথের দিকে চাহিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "বুড্‌ঢা বিক্রমের শীকার খেলা দেখ্‌তে এসেছ বুঝি? সেই রাতের কথা মনে পড়ে বিশ্বনাথ? ওঃ, সে কতদিন হলো—কই তুমি ত কিছু বদলাও নি, ঠিক্ তেমনি আছ! আমার কিন্তু সে বল আর নেই। ছয়টা ডাকাত আজ আমায় হারিয়ে দিয়ে গেল।"

বিশ্বনাথ বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনি আমার গুরু, আপনাকে কে জয় কর্‌তে পারে? কই, আপনার গায়ে ত আঁচড়ও লাগেনি। কিন্তু তারা সব প্রাণের ভয়ে পালিয়েচে।"

বিক্রম স্মিতমুখে কহিলেন, "আমায় তারা মূর্চ্ছিত করে গেছে বটে, কিন্তু কাপুরুষগুলো আমার এই বালিকা কন্যার তরওয়ালের কাছে দাঁড়াতে পারেনি বিশ্বনাথ! সেই আহ্লাদে আজ আমি নিজের অপমান ভুলে গেছি। আজ মার সেই ভৈরবীমূর্ত্তি তোমরা দেখতে পেতে ত আমার আনন্দ বুঝ্‌তে!" মীরা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল!

* * * * * *

বিক্রম সিংহের মুখে বিশ্বনাথ পলায়নপর ডাকাইতদের সকল কথা শুনিল। তাঁহার মূর্চ্ছার অবসরে যাহা ঘটিয়াছিল, মীরা তাহা বিবৃত করিল। বিশ্বনাথ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল; ইচ্ছা, তখনই বৈদ্যনাথের অনুসরণ করিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে। এবং সে জন্য বিক্রমের কাছে বিদায় ভিক্ষা করিল।

ভগবান বলিল,—"বিশু! কোম্পানিবাহাদুর তোমার নামে হুলিয়া করেচে, এ সময়ে তোমার বাপু রাগ একটু সামলাতে হয়। বদে তোমার হাট হদ্দ সব জানে। এখন একটু বুঝে সুজে কাজ করো। কি বলেন সিংহী মশায়?"

বিক্রম সিং এই পরামর্শ অনুমোদন করিয়া কহিলেন—"বিশ্বনাথ, বদের দলের খেলোয়াড় দেখে আজ আমার মনে হয়েচে, বাঙ্গালী লড়ায়ে

পটু নয় বলে যে বদনাম আছে, সেটা ডাহা মিছে কথা। তোমার দলে তেমন খেলোয়াড় কত আছে জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়, ইচ্ছা করলে তুমি কোম্পানীকেও একদিন হাত দেখাতে পার। কিন্তু তোমার দলে অধর্ম্ম ঢুকেচে। বদের আজকের ব্যবহার তার প্রমাণ। নারায়ণ তোমার প্রতি বিরূপ না হলে আর এমনটি ঘটে না। কোম্পানীর হুলিয়ার কথা শুনে তোমার জন্য আমার ভাবনা হলো।"

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল, "জন্ম হলেই মরণ আছে, তাতে আমার ভয় নেই। ভাবনা কেবল এক বুড়ো মার জন্যে। তা মা কালীর যদি সেই ইচ্ছে, আমার তাতে হাত কি সিংহী মশায়? তবে কুকুর বিড়ালের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা, সে আমার কর্ম্ম নয়। আশীর্ব্বাদ করুন, বিশে যেন মানুষের মত মর্‌তে পারে।"

এই কথার পর বিশ্বনাথ সরলার কথা পাড়িল। বৈদ্যনাথ সরলার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে শুনিয়া বিশ্বনাথের বড় কষ্ট হইতেছিল। সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল, ইচ্ছা সরলাকে দিয়া যায়। কিন্তু স্পষ্ট বলিতে সাহস হইতেছিল না। ভগবান বিশুকে যেমন চিনিত, এমন আর কেহ নহে। সরলা মীরার কাছে নিকটেই বসিয়া ছিল। হাসিয়া ভগবান তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মা, আজ আমারি মা হয়ে তোমার এই বিপদ গেল। বিশু তোমার আর একটি ছেলে। তার ইচ্ছে, বদে তোমার যা নিয়ে গেল, তার কতক ফিরিয়ে দিয়ে যায়! তার পর চাই কি, সবই পাওয়া যেতে পারে। পথে তোমার খরচপত্রের দরকার। ডাকাত ছেলের প্রণামী কিছু নিতে দোষ কি মা?"

সরলা কথা কহিল না, কিন্তু মীরার কানে কানে অসম্মতি জানাইল। মীরা সে কথা বলিলে বিক্রম কহিলেন, "খরচ যা পড়ে, আমি দেব। এর পরে পাঠিয়ে দিস্ মা!" ইহাতেও সরলা সম্মত হইল না। অতি মৃদুস্বরে মীরাকে বলিল, "দিদি! আমার ছেলেদের বল, এখন এই এক বদে

-ার

আমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ভাল!” বিশ্বনাথ প্রশংসমানচিত্তে এ কথা শুনিল। সরলার প্রতি তাহার স্নেহ মায়া শতগুণে বাড়িয়া গেল। বস্ত্রমধ্য হইতে এক লৌহাঙ্গুরীয় বাহির করিয়া বলিল, “মা, এ একটা লোহার আংটী, এ নিতে তোমার কি আপত্তি? যদি কখন বিপদে পড়, এইটে পাঠিয়ে ছেলেকে মনে করো!”

তার পর বিশ্বনাথ ভগবান সহ বিদায় হইয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কন্যাভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিশ্বনাথের কাছে বিদায় হইয়া গেলেন বটে কিন্তু যেখানে গেলেন, সেটা তাঁর বাড়ী নহে। পিতৃভিটা সম্ভবত মনুষ্যমাত্রেরই গৃহ বটে কিন্তু বাঙ্গলা দেশে কুলীন ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের পক্ষে সচরাচর তাহা ব্যতিক্রমস্থল। ঠাকুরটি ফুলের মুখুটী বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, পিতৃভূমি জগতি গ্রামের বড় ধার ধারেন না। চূর্ণীগঙ্গাসঙ্গমের অদূরবর্ত্তী মথুরাপুরে তাঁহার মাতুলালয়, মাতামহের অনেকগুলি লাখেরাজ জমী এবং কোঠা বাড়ীর উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি জগতির মেটে ঘর এবং বিঘা দশেক নিষ্কর ভূমির মায়া অনেক কাল হইল একরূপ কাটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার বৃদ্ধা বিধবা পিসি এবং নামমাত্র পরিণীতা ভগিনীদ্বয় জ্ঞাতিগণপরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। ঠাকুর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে যাতায়াতের পথে মাঝে মাঝে বুড়ো পিসি প্রভৃতিকে দেখা দিয়া যাইতেন।

বিনোদবিহারীর বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশের অধিক নহে; কিন্তু এই বয়সেই অকাল বার্দ্ধক্য কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ লোকে বলে, তাঁহার শৈশবে পরিণীতা গৃহিণীযুগল। উভয়ে

সহোদরা এই গ্রাম মথুরাপুরের কন্যা। ঠিক্ বলা যায় না, কিন্তু শুনিতে পাই, দুজনেই স্বামীর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। ইহার উপর কনিষ্ঠা আজ কয় বছর হইল একটি কন্যা উপহার দিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন, ভার্য্যার মধ্যে তিনিই ভর্ত্তার প্রেয়সী। ফলত দুই বোনের কলহের জ্বালায় ঠাকুরকে সশঙ্কিত থাকিতে হইত। বিবাহব্যবসায় এবং স্বজাতির কুলরক্ষাকার্য্য মহাকুলীনের সনাতন ধর্ম্ম। পত্নীরা সুতরাং স্বামীর যদৃচ্ছা বিবাহপ্রবৃত্তির প্রতিরোধ করিতেন না। অতএব এ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশটি সপত্নীকণ্টক যোজনা করার পর প্রভু যখন চতুর্দ্দশের পাণিপীড়নার্থ সাদর নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন, উভয় ভগ্নী স্মিতমুখে দিন কতকের জন্য তাঁহাকে রেহাই দিতে আপত্তি করিলেন না। বড় ভাবিলেন, অনেক দিন ধরে বাড়ী বসে থেকে মিন্সেটা একেবারে বয়ে গেল— আন্তরিক যত টান ছোটর উপর। দিন কতক বাইরে বাইরে থাকে, সে ভাল। ছোট বোন স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়াছিলেন, একমাত্র কন্যাকে যার তার হাতে দেওয়া হবে না। সে জন্য এখন থেকে উদ্যোগ চাই। বিবাহ করিবার অছিলায় তিনি পাত্র এবং অর্থ দুয়েরই ফিকিরে ঘুরিবেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন কি না, সে খবর আমরা রাখি না। কিন্তু তিনি কন্যাদায়ের ভাবনায় সে উদাসীন ছিলেন না, সে পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি!

আহারান্তে বিনোদবিহারী শয্যাগ্রহণ করিলে পর, তাঁর পিসি ঠাকুরুণ শিয়রে বসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং বৃদ্ধার দর্শনশক্তি ছিল না বলিলেও হয়। তথাপি অভ্যাসগুণে তিনি বিস্তর উৎকুন ও তাহাদের ভাবী বংশধরদের সংহারসাধন করিতেছিলেন। মুখে নানা গল্প চলিতেছে। ভ্রাতুষ্পুত্র কতক শুনিতেছিলেন, কতক বা শুনিতেছিলেন না—তিনি অধিকাংশ কাল সন্ধ্যাকালের ঘটনা মনে করিয়া অন্যমনস্ক হইতেছিলেন পাঁচ শ’ টাকার

কথা মনে হইলে আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিলেন, এবং তখন ছোট বউর হাসি-মুখখানি চোকের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে পিসি বলিয়া উঠিলেন, "বিনোদ! তোর দেবীপুরের শাশুড়ী মো'ল, শুন্‌তে পাই তার অনেক টাকা ছিল। কত টাকা পেলি বাবা?"

বিনোদ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। সাগ্রহে শুধাইলেন, কবে শাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে?

পিসি। শুন্‌ছি এই সে দিন মরেছে—মাস খানেকও হবে না। সে কি, কিছুই তুই জানিস্‌নে?

বিনোদ কেবল বলিলেন, "কেমন করে জানবো পিসিমা, তিন মাস হলো আমি বিদেশে ঘুর্‌চি।" বিনোদের হৃদয় বিষম আন্দোলিত হইতে-ছিল। সে রাত্রে তাঁর ভাল নিদ্রা হইল না। নয় বছরের আগের সেই নয় বছরের ফুট্‌ফুটে কনেটির কথা মনে পড়িতেছিল কি? বলিতে পারি না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জগতি হইতে দেবীপুর পূরা এক দিনের পথ। প্রত্যূষে মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্বশুরবাড়ী মুখে ছুটিয়াছেন। তাঁহার জানা ছিল, শ্বশ্রূঠাকুরাণী অনেক টাকার কারবার করিতেন; সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণের পর এক্ষণে সে সমস্ত ধনসম্পত্তিতে অধিকার তাঁহারই। বিনোদবিহারী নয় বৎসর আগে সেই যে এক দিন বিবাহ করিতে দেবীপুর গিয়াছিলেন, তার পর আর কখন সে-মুখো হন নাই! একেই কুলীন জামাতাদের শ্বশুরালয়ে যাতায়াত কালে-ভদ্রে ঘটে, তার উপর এ ক্ষেত্রে একটু কথা ছিল। শাশুড়ী বছর কয় পরে একবার জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।

বিনোদ বুঝিলেন, ধনশালিনী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা আদায়ের সে এক দাঁও বটে। বিস্তর টাকার দাবি শুনিয়া শাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, "বাবা, আমার আর কে আছে? যা কিছু সামান্য আমার আছে, সে সব তোমারই। কিন্তু অত টাকা তোমায় দিব কোথা হইতে? তুমি যদি এসে মাঝে মাঝে তোমার শ্বশুরালয়ে থাক্, আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবে।" এই চিঠির ভঙ্গীতে বিনোদ চটিয়া লাল হইলেন। তাঁহার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, শাশুড়ী তাঁহাকে ঘরজামায়ে হইতে অনুরোধ করিতেছেন। সেই অবধি বিনোদবিহারী দেবীপুরের শাশুড়ীর ও শ্বশুরকন্যার আর কোন খোঁজ খবর করেন নাই।

কিন্তু এখন? এখন আর সে রাগ অভিমান ছিল না। ছেলে এবং বুড়ায় তফাৎ এই যে, একে রাগদ্বেষাদির প্রয়োগস্থলে জড়ে ও মনুষ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান করে না, অন্যে—যুবায় বা বৃদ্ধে—সে উদারতা নাই। শিশু হইলে বিনোদ শাশুড়ী এবং তাঁর ধনসম্পত্তি, দুইয়েরই উপর সমান বিরক্ত হইতেন, এককে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেন না। এ পরিণত বয়সে কিন্তু সে জ্বালা ছিল না। বিনোদ পরম হৃষ্টমনে স্বর্গীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর গুপ্ত এবং ব্যক্ত অগাধ ধনের স্বামিত্ব কল্পনা করিয়া পথ চলিতেছেন। কিন্তু যে এই সবের মূল, তার কথা কয় বার মনে হইতেছিল? বলিতে পারি না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেবীপুরে পৌঁছিলেন। গ্রামের কাহারও কাছে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি পরিচিত ছিলেন না; বিনা পরিচয়ে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। শ্বশুরালয়ে প্রতিবেশিমণ্ডলী তাঁহাকে শ্বশুরালয়ের চন্ডীমণ্ডপে বসাইয়া সকল কথা শুনাইয়া দিল। তাহারা জনরবে শুনিয়াছিল, সরলা পথে ডাকাইতের হাতে পড়িয়াছে। অনেকে সেনয়া তিনি রিল। এ সকলই যে সরলার ভাদ্রমাসে কাহারও কথা না

শুনিয়া গৃহত্যাগের ফল, ইহা বক্তাদের মত শ্রোতা বিনোদবিহারীও একবাক্যে স্বীকার করিলেন স্ত্রীর উপর তাঁর সন্দেহ ও ক্রোধের সীমা রহিল না।

কিন্তু এই সন্দেহ ও ক্রোধ ঠিক ব্যাহত শার্দ্দূলের আক্রোশের মত—মনুষ্যোচিত পতিপত্নীর ক্ষুণ্ণ দাম্পত্যসঞ্জাত নহে। সরলার গৃহত্যাগের দিন নিশীথে, যে বসু মহাশয় তাহার গৃহহর্ম্ম্যতল খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া গুপ্তধন-লাভে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তিনিই মুখোপাধ্যায়কে সর্ব্বপ্রথমে জানাইয়া আপ্যায়িত করিলেন যে, সরলা মেয়েটি নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া না হইলে মাতার ত্যক্ত সমস্ত ধন সঙ্গে লইয়া গিয়া ডাকাইতের হাতে সমর্পণ করিত না। বিনোদবিহারী হৃদয়ে অমিত ধনলাভ আশা পোষণ করিয়াছিলেন, সহসা ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় অবসন্ন হইলেন। এবং পত্নীই তাঁহার হতাশ্বাসের একমাত্র কারণ জানিয়া, তাহার উপর জাতক্রোধ হইলেন।

প্রভাত হইতে না হইতে বিনোদবিহারী আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। নৌকাপথে গোবরডাঙ্গার হাট যত দীর্ঘ, পদব্রজে তাহার অর্দ্ধেক নহে। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সেখানে পৌছিয়া স্নান করিলেন। ইচ্ছা, জলযোগ করিয়াই গৃহাভিমুখে ছুটিবেন। দেরিমাত্র সহিতেছিল না। সম্ভবত লক্ষ্মীছাড়া বউটা মথুরাপুর গিয়াছে,—গিয়াই তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে। দুশ্চিন্তায় ঠাকুরের মুখটা মলিন ও ভার ভার দেখাইতেছিল। তিনি জলপানের জন্য ভগবানের দোকানে গিয়া বসিলেন।

ভগবান মদক আহারাদি শেষ করিয়া চশ্মা-চক্ষে চৈতন্যচরিতামৃত পড়িতেছিল। ঠাকুরকে দেখিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল। বিনোদ-বিহারী জলযোগ করিয়া তখনি যাত্রা করিবেন শুনিয়া ভগবান তাঁহাকে অনুরোধ করিল, "দেবতার যখন পার ধূলা পড়িয়াছে, দুটি পাঠান। সবা

করিতেই হইবে। ন'ইলে মধ্যাহ্নে অতিথি বৈমুখ্যের দারুণ পাপ তাহাকে স্পর্শ করিবে।" বিস্তর জেদাজেদির পর ঠাকুর কি করেন, সম্মত হইলেন। মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ী মথুরাপুরে শুনিয়া ভগবানের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী স্বভাবত অর্থপিশাচ ছিলেন না। কিন্তু সে কালে কুলীন মহাশয়েরা শ্বশুরবাড়ীকে জমীদারী ছাড়া আর বড় কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারিতেন না। কাজেই সরলার উপর তাঁহার রাগটা নিতান্ত অহেতুক বলিলে চলিতেছে না।

ভগবান সরলার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। কথাচ্ছলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মহাকুলীন ও বহুদার বলিয়া জানিয়াছিল। একটু একটু সন্দেহ করিল, তিনিই সেই দুঃখিনী ব্রাহ্মণ-কন্যার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইবেন। কিন্তু প্রতীতি হইতেছিল না। তাই ভগবান মদক ঠাকুরের আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিয়া তাঁর কাছে একটু ঘনাইয়া বসিল।

বিনোদবিহারী বেশ কাজের লোক ছিলেন না,—বাক্যসংযমের মহিমা তিনি কখন বুঝিতেন না। ভগবানের মিষ্টান্ন ও মিষ্ট কথার উপহার দুই দণ্ডের ভিতর তাঁহার চিত্তমলা কতকটা দূর করিয়াছিল। নিরাশা আসিয়া মাঝে মাঝে হৃদয় দংশন করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গল্পস্রোত বন্ধ হয় নাই। ঠাকুর অন্যান্য নানা কথার মধ্যে অম্লান-বদনে ভগবানকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার দেবীপুরের বিবাহ তিনি আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সে স্ত্রী তাঁহার বাটী গিয়াছে শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি গৃহে চলিয়াছেন। এবং তাঁহার আদেশে তাঁর

গৃহবাসিনী পত্নীযুগল তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে, তবে তাঁহার রাগ যাবে!

আহারান্তে ঠাকুর চলিয়া গেলেন! এ দিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবামাত্র ভগবান কন্যাটিকে ভুলাইয়া ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইল, এবং দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। বিশ্বনাথদত্ত রণ্‌পা জোড়াটি সৌভাগ্যক্রমে দোকানেই ছিল। ভগবান অন্ধকারে ছুটিয়া চলিল।

* * * * *

পরদিন প্রাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাটী পৌছিলেন। দেখিলেন, তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহার কোন ভিত্তি নাই। নববধূর উপর ঝাল ঝাড়িবার স্থবিধা না হওয়ায় মুখটা তাঁহার তেমন প্রসন্ন দেখাইতেছিল না। জ্যেষ্ঠাপত্নী দেখয়া বলিলেন,—মরণ আর কি! মিন্সের রকম গ্যাখ, তিন মাস পরে বাড়ী এলেন, হাঁড়িপানা মুখ কোরে! ছোটকে না দেখ্‌লে হাঁসি বেরুবে না। এর পরে হাঁসি দেখ্‌লে ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়িয়ে দেব।”

এ দিকে ভগবান সেই রাত্রে প্রথমত পরিহার গ্রামে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিল, সরলার নৌকা প্রাতে রওনা হইয়া গিয়াছে। তখন ভগবান পরিপূর্ণা চূর্ণীর কূলে কূলে বেগে ছুটিয়া চলিল, যদি নৌকা ধরিতে পারে। বদনের নামটি ভগবানের মনে ছিল। অন্ধকারে নদীবক্ষে একটা কিছু দেখিলেই ভগবান উচ্চকণ্ঠে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া নিশীথনীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। শেষে সত্য সত্যই বদন উত্তর দিল।

ভগবান সরলাকে সকল কথা বলিয়া অনুরোধ করিল, তিনি অপমানিত হইবার জন্য স্বামিগৃহে না যান।

স্বামীর পরুষ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সরলা মর্ম্মাহত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। স্বর্গীয়া মাতাকে মনে পড়িয়া এক ফোঁটা জল চক্ষে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু ক্ষীণ দীপা-

লোকে পর্দ্দার আড়ালে আর কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। বিষাদের হাসি হাসিয়া সরলা উত্তর করিল, "তা আমার মান বল, অপমান বল, সেই ঠাঁই ছাড়া আর গতি নেই। সেখানে গিয়ে দাসীপনা কর্‌তেও কি পাব না।" ভগবানের চক্ষে দরদরিত ধারা পড়িতেছিল। সে বলিল, "মা, ছেলের যা কাজ, আমি তা কর্‌লাম। বিশুর কথা মনে করো। যদি কখন বিপদে পড়, আমাদের একবার খবর দিও। কিন্তু তুমি সাধ্বী সতী, তোমার কোন অমঙ্গল হবে না।"

ভগবান চলিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সরলার নৌকা মথুরাপুরের ঘাটে পৌছিল। আকালের মা রাত্রের কোন খবর রাখিত না—বারম্বার বদনকে নাতজামায়ের কাছে পাঠাইবার জন্য সরলাকে অনুরোধ করিল। সরলা বলিল, "আয়ি বুড়ী, সন্ধ্যা হয়ে এলো, তাদের বাড়ীও কাছে। পাল্কী কোরে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া কুলীন বামনীদের রীতি নয়!" বুড়ী অসন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে সরলা স্বামিগৃহে উপস্থিত হইল। একবস্ত্রে, সম্বলমাত্রশূন্যা—এর চেয়ে নিঃসহায় অবস্থা আর কি হইতে পারে? যাঁর হাতে সমর্পণ করিয়া মাতা কন্যার নারীজন্ম সফল হইল ভাবিয়াছিলেন, এই দুর্দ্দিনে তিনি সত্য সত্যই কি চরণে স্থান দিবেন না? সন্ধ্যায় স্তিমিত প্রকৃতি মুখে মানুষ জীবনের চিরপোষিত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দেয়—কিন্তু সরলা জোর করিয়া নিরাশাকে হৃদয় হইতে দূর করিতেছিল; কেন না, বালিকা এই সবে প্রথমে সংসারসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিল,—আশায় আবার নৈরাশ্য আছে তাহা সে কখন জানিত না।

সরলা যখন গৃহে পৌছিল, তাহার সপত্নী কন্যা "পুঁটি" তখন রান্নাঘরে খাইতে বসিয়া মহা "খোট্" লাগাইয়াছিল, এবং তার বয়স আট বছরের কম না হইলেও মাতা তাহাকে নিতান্ত শিশুর মত ভুলাইতেছিলেন। মা বলিতেছিলেন, "শীগ্‌গির যদি না খাবি, পেত্নীকে আর জুজুবুড়ীকে ডেকে ধরিয়ে দেব!" বাটীতে প্রবেশ করিয়া সরলার পা উঠিতেছিল না, ভারি লজ্জা লজ্জা করিতেছিল। কি করিয়া আত্মপরিচয় দিবে? কিন্তু মাতা-কন্যার এই আলাপে একটা সুযোগ উপস্থিত হইল। সরলা সাহস করিয়া বৃদ্ধা আয়ি বুড়ী সঙ্গে রসুই-ঘরের দ্বারপথে উঠিয়া দাঁড়াইল। অপ্রতিভের মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "দিদি, পেত্নীকে তুমি ডাক্‌ছিলে, তাই আমি জুজুবুড়ীকে নিয়ে এসেছি!"

ক্ষীণ মৃন্ময় প্রদীপালোকে সরলার সুকুমার দেহ দেবী-প্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিয়া কন্যার মত মাতাও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। সরলা সেই ভাবে কাছে গিয়া বসিল, আকালের মা পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নাতিনীর আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল।

সরলা বলিল, "দিদি! আমায় চিন্‌তে পার কি? কেমন কোরে পার্‌বে, কখন ত দেখনি। আমি দেবীপুর থেকে আস্‌চি। সেখানে তোমার একটি বোন আছে, তা বোধ করি তুমি জান।"

ছোট বউর ধড়ে প্রাণ আসিল, কিন্তু মুখে হাসি আসিল না। হাসির কথাও নহে। নবযৌবনপ্রফুল্ল, প্রভাতকমলের মত সুন্দরী সপত্নী আসিয়া জাঁকিয়া বসিতেছে। মেয়েমানুষের প্রাণে হাসি কি বেরোয় গা? তবে ছোট বড়র মত সর্পিণী ছিলেন না, খলকপট বড় জানিতেন না। সরলার মুখে চোখে হাস্যের বিরাম ছিল না। পথে সে মনঃস্থির করিয়া আসিয়াছিল।

ছোট বউ পুঁটিকে ভাত খাওয়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তা হাঁ বোন, বলি ভরা ভাদ্দর মাসে খবর না পাঠিয়ে তুমি এলে কেমন করে?

কুলীন বামুনের শ্বশুরবাড়ীতে কি সুখ যে, মা বাপ ছেড়ে এ ভাবে তুমি এসেছো! আমাদের গাঁয়ে বাপের বাড়ী, বাপের বংশে কেউ নেই, কাজেই থাক্‌তে হয়েছে। দুটি বোনে আছি, তবু দিনরাত চালে কাক বস্‌তে পায় না। সতীনের সম্বন্ধ এমনি ছাই!"

পথে এ কথাটা দুই একবার সরলারও মনে হইয়াছিল। কিন্তু অন্যের মুখে কিছু তীব্র শুনাইল। সরলা নতনয়নে বলিল, দিদি, এক মা ছিলেন, তিনিও চলে গেলেন! এ বয়সে কার কাছে থাকি বল? তাই দিনক্ষণের অপেক্ষা করি নি। কিন্তু হাতে হাতে তার ফল পেয়েছি। পথে ডাকাতের হাতে পড়ে সর্ব্বস্ব খুয়িয়ে এলাম।"

ছোট বউ বড় গল্পপ্রিয়। ডাকাতের কথা শুনিয়া সাগ্রহে সে গল্প শুনিতে চাহিলেন। আকালের মাকে বলিলেন, "বস বাছা, ঐখানে বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" সরলা "ও একটু কম শুন্‌তে পায়!" ছোট বউ উচ্চরবে বসিবার অনুরোধটি পুনরুক্ত করিলেন। তাহাতে বুড়ী বসিল বটে, কিন্তু আর এক জন উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় বউ ঠাকুরাণী ইহারই মধ্যে শয্যা গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, কোন ছলে ছোটর সঙ্গে একটা ঝগড়া তুলিয়া স্বামীকে আজ রাত্রে জ্বালাতন করেন। ছোটর উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বড় বউ ঠাকুরাণীর আসন যদি টলিল, তবে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পা টিপিয়া টিপিয়া ছোট বউর রান্নাঘরের দিকে গিয়া তিনি স্পষ্ট দুই জনের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। একবার সন্দেহ হইল, তাঁহাকে লুকাইয়া ভর্ত্তা তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যার সঙ্গে নিরিবিলি

প্রেমালাপ জুড়িয়া দিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তটা সমূলক হইলে বড় গিন্নির ব্যাঘ্রীর মত সেই প্রেমিক-যুগলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার ভারি সুবিধা হইত, এবং একটা তুমুল কলহেরও সুযোগাভাব ঘটিত না। কিন্তু অপর কণ্ঠ ত বিনোদবিহারীর নহে। স্বর অপরিচিত, কিন্তু বড় মধুর। মথুরাপুর গাঁয়ের বউঝি সবারই সঙ্গে বড় বউঠাকুরাণীর স্বরপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে,—কই, তাদের কাহারও স্বরে ত এমন সুর বাজে না। বিস্মিত, কৌতূহলপরবশ হইয়া দিদি বোনের পাকশালায় উঁকি মারিলেন। বলিলেন, "কার সঙ্গে কথা কচ্চিস্ লা গিরি ?"

ছোট বউর নাম গিরিবালা। বড় গিন্নি ছোটর সঙ্গে পূর্ব্ব সম্বন্ধটা মনে পড়িলে তাহাকে একবার একবার নাম ধরিয়া ডাকিতেন,—নহিলে নহে। গিরিবালা এবং সরলা উভয়ে যুগপৎ দ্বারাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। বড় বউ যার কণ্ঠ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, দেখিলেন মূর্ত্তিতেও সে মনোমোহিনী। আবার সুধাইলেন, "মেয়েটি কে লা গিরি ?"

গিরিবালা গম্ভীর হইয়া বলিল, "সতীন !" সে গাম্ভীর্য্য একটু একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত। "দেবীপুরের সতীন ! বোন, উনিই বাড়ীর গিন্নি, শুভদৃষ্টি করে নাও এই বেলা।" তখন ছোট বউ সরলাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বড়কে দেখাইয়া দিল।

সরলা উঠিয়া বড়কে প্রণাম করিল। কিন্তু আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে ছুটিয়া পলায়নপরা জ্যেষ্ঠা সতিনীর অজস্র গালি তাহার ও ছোট বউয়ের উদ্দেশে অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তাটির অংশও বাদ যাইতেছিল না।

এই মুহূর্ত্তে বিনোদ গৃহে আসিলেন। বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই জন্যে ঘরে আস্‌তে ইচ্ছা করে না। তিন মাস বিদেশে ছিলাম, সে বেশ ছিলাম। গলা ত নয়, যেন কাঁসর !"

সরলার মোহিনীকণ্ঠ বড় বউর মনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

ছুটিয়া আসিয়া তিনি স্বামীর পায়ের উপর পড়িলেন, এবং গণিয়া গণিয়া বিশ বার জোরে জোরে মাথা কুটিলেন। মুখেরও বিরাম ছিল না। "কাঁসরের মতন গলাই বটে। বাই খেমটি এনেছিস্, এখন মিষ্টি মিষ্টি গলা শোন্। ছোটর সঙ্গে পরামর্শ করে দেবীপুর থেকে আদ্ধেরে বউটাকে এনেছেন—আমাকে তাড়াবার জন্যে। ওলো শতেকখোয়ারীরে, আমাকে তাড়াবি তোরা! মোলেও আমি পেত্নী হয়ে তোদের জ্বালাব! এই চল্লাম গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে!" তখন বড় গিন্নি ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরের ঘরে গেলেন, এবং দ্বার জানালা সব বন্ধ করিতে লাগিলেন। শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বিনোদবিহারী পাকশালের দিকে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আকালের মা সরিয়া দাঁড়াইল, সরলাও কোণের দিকে সরিয়া গেল। বিনোদ ছোট বউর উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্ধ্যা হতে না হতে কি এ ব্যাপার? এরা সব কে?"

গিরিবালা সকল কথা খুলিয়া বলিল। ততক্ষণ আকালের মা বুড়ী নাতজামাইকে ছুটো সরসসম্ভাষণের জন্য বাক্যরসসঞ্চারের চেষ্টা করিতেছিল।

বিনোদবিহারী সরলার আগমনবার্ত্তায় ক্রোধে অধীর হইলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকটাকে এখনও তোমরা ঝাঁটা মেরে তাড়াও নেই? বড় বউ রেগেছে, বেশ করেচে। ও একটা বিষম মেয়েমানুষ, ওর কথা শুনে আমি অবাক্ হয়েছি। হিন্দুর ঘরে, বিশেষ বামুনের ঘরে এমন মেয়েও জন্মায়! ভাদ্দরমাসে সর্ব্বস্ব নিয়ে বাড়ী থেকে কে কবে বেরোয়? লক্ষ্মীছাড়ি, ডাকাতের হাতে পড়ে সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে পথের ভিকিরী হয়ে আমার কাছে মর্‌তে এসেচে!"

ছোট বউ বলিলেন, "ছি, অত কটু কথা কি তোমার বলা সাজে? মা মরে গেছে, এই সোমও বয়সে কোথায় দাঁড়ায় তা বল?"

রাগের মুখে যথার্থ কথায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও রাগিয়া গেলেন। বিশেষ স্ত্রীলোকের মুখে ন্যায়ের কথা! বিনোদ কহিলেন, "অত সাহস যে মেয়ের, সে কখন ভাল নয়। পথে আজ ৭।৮ দিন ওর কোথায় কাটলো? কোথায় কি ভাবে ছিল, কে জানে?"

এবার সরলা কথা কহিল। কেন না, তাহার সতীত্বগর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছিল। ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত কথায় সে পথের দৈনিক বিবরণ বিবৃত করিল। কথা বলিতে বলিতে চোকের জল মুছিতেছিল।

স্বামী বলিলেন, "ও সব মিছে কথা! একটিও আমি বিশ্বাস করিনে! যে স্ত্রীলোক কুলের বার হয়ে এসেছে, আমি তাকে গ্রহণ করতে পারি নে।"

সরলা মাতাকে স্মরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল। বলিল, "ওগো আমার আর কেউ নেই! সত্যি সত্যি আমি আজ পথের ভিখারিণী। তোমরা আমায় না নাও, বাড়ীতে থাকতে দাও। দাসীপনা করে কাটাব।"

মুখোপাধ্যায় টলিলেন না। অভ্রান্ত ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—"কুলত্যাগিনীকে আমি আশ্রয় দিতে পারি নে। ছোট বউ! তুমি বুঝিয়ে দাও।"

গিরিবালা বলিলেন, "ছি ছি, তুমি মানুষ না রাক্ষস! বোন, তুমি শোন কেন, বিয়ে করে ভার নেবার বেলা কুলীন বামুনগুলোর মাথায় বাজ পড়ে। দুর্ব্বাক্য ছাড়া আর উপায় কি?"

সরলা স্বামিকৃত অপমানে জলিয়া উঠিল। আপন মনে ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এই স্বামী? এই অধার্ম্মিক আমার দেবতা?"

সে কথা বিনোদবিহারীর কানে গেল। ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ত্যাখ ছোট বউ, তুমি ওকে ভালোয় ভালোয় বিদায়

না কর্‌তে পার ত বল, আমি বড় বৌকে বলি, ঝাঁটা মেরে তাড়াবে এখুনি !”

বিনোদ আর দাঁড়াইলেন না। ওদিকে সরলা মেঘমধ্যে বিদ্যুৎবৎ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। আক্রালের মা সব বুঝিতে না পারিলেও আসল কথা বুঝিল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সরলার অনুসরণ করিল।

এই সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে একটা বিকট কণ্ঠরব শোনা গেল। আগন্তুক ডাকিল, “মুখুয্যে মোশাই ঘরে আছ ?”

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী রন্ধনশালা হইতে দ্রুতপদে শয়ন গৃহের দিকে চলিলেন,—কেন না, বড় বউ যে দিন গলায় দড়ি দিবার ভয় দেখান, সে দিন অন্তত কণ্ঠদেশে অঞ্চল বেষ্টন না করিয়া ছাড়েন না। কিন্তু এমন সময়ে প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ ধান্য গোলার উপর হইতে কাল পেচক চীৎকার করিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে বিকট কণ্ঠে বহির্ব্বাটীতে কে ডাকিল,—“মুখুর্য্যে মোশাই, বাড়ী আছ ?” ইহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অশুভ আশঙ্কা করিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, উত্তেজিতা রাজহংসীর মত গ্রীবা হেলাইয়া এইমাত্র যে তরুণী দৃঢ় বাক্যে বলিতেছিল, “এই স্বামী ?—এই অধার্ম্মিক আমার দেবতা ?” ক্ষীণদীপালোকদৃষ্টা রোষচঞ্চলা তাহার সে মহিমাময়ী মূর্ত্তি মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠিল। এমন সময়ে বিকৃতকণ্ঠে আবার কে আওয়াজ দিল,—“বলি মুখুয্যে মোশাই বাড়ী আছ কি না ?”

বহির্বাটীতে আলো ছিল না।—আগন্তুক বৈঠকখানার নীচে বৃহৎ যষ্টিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সম্মুখে সোপানের উপর কিছু

একটা পড়িয়াছিল, অন্ধকারে বুঝা যাইতেছিল না। বিনোদ সেই অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটা কে, চিনিতে পারিলেন না। তাহার মাথায় হিন্দুস্থানী ধরণে দীর্ঘ পাগ্‌ড়ী বাঁধা ছিল, পরিচিত হইলেও সে ঘোরান্ধকারে চিনিতে পারার সম্ভাবনা ছিল না। বিনোদ সুধাইলেন, "কে তুমি? আমার কাছে কি দরকার?"

পাগড়ীধারী সে কথার উত্তর দিল না। তাহার বদলে সুধাইল—"ঠাকুর, দেবীপুরের জয়দুর্গা ঠাকুরুণ আপনার কেউ হতেন কি?"

জয়দুর্গা সরলার স্বর্গীয়া মাতার নাম। কাজেই ঠাকুরের শাশুড়ী। কিন্তু এইমাত্র শ্বশ্রূকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিতে বিনোদবিহারীর কেমন বাধ-বাধ করিতেছিল। উত্তর দিতে দেরি দেখিয়া আগন্তুক একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"ইস্তিরি বুঝি?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রাগ তখনও শমিত হয় নাই। গালি খাইয়া আরও চটিলেন। ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, "কে হে তুমি বেয়াদব? কথা বল্‌তে জান না?"

যার উপর রাগ, সে হাসিল। সেই বিদ্রূপের ভাব স্থির রাখিয়া আবার বলিল, "ঠাকুর, আদব কায়দা যদি জান্‌ব, তবে আর মোট মাথায় করে তোমার দুয়ারে এসেছি কেন? কেন অন্যায় কথাটা কি বলিছি? তুমি কুলীন বামুন কত বিয়ে করেছ! কোথায় কে তোমার ইস্তিরি কি শাশুড়ী বেয়াদব লোকেরা জান্‌বে কেমন করে ঠাকুর?"

আগন্তুক একটু একটু বিকৃত কণ্ঠে কথা কহিতেছিল। তথাপি বিনোদের মনে হইতেছিল, স্বর পরিচিত বটে। সে আবার বলিল, "ঠাকুর! শুন্‌লাম, জয়দুর্গা ঠাকুরুণের মেয়েটি তোমার বাড়ী এসেছেন। তাঁর একটি পেটারি চুরী গিয়েছিল। সেটি পাওয়া গেছে, আমি তাঁকে তাই দিতে এসেছি! তাঁকে একবার ডেকে দাও, আর একটা আলো আন ঠাকুর!

গেরস্তর বাড়ীতে সন্ধ্যে হতে না হতে এত অন্ধকার, একটা পিদিম বাইরে রাখতে পার না? ঠাকৃরুণেরো ত শুন্‌চি গলা জাহির করতে খুব মজবুত!"

শাশুড়ীর হৃত-ধনগুলির পুনঃপ্রাপ্তির আশায় বিনোদের রাগ জল হইয়া আসিল! আগন্তুক লোকটাকেও পরিচিত মনে হইতেছিল। কিন্তু তিনি একটু সঙ্কটে পড়িলেন। সরলা বাটীর বাহির হইয়া গেল, তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। এ লোকটা তাকে চেনে কি? পেটারি লইয়া যাইবার জন্য সরলাকে বাহিরে আসিতে হবে, তার মানে কি? বিনোদ কৌশল অবলম্বন করিলেন। বলিলেন, "হাঁ, মৃতা জয়দুর্গা ঠাকৃরুণের কন্যাকে আমি বিবাহ করি। কুলবধূর বাহিরে আসার কি দরকার? পেটারি যদি তাঁকে দিতে এসে থাক, আমার কাছে দিলেই হবে!"

পেটারিবাহক তাহাতে সম্মত হইল না। বলিল, "ঠাকুর! তোমারে আমি চিনি নে। তাঁকে চিনি! চুরীর জিনিস, ভয় করে। যার জিনিস তার হাতেই দেব। তিনি একবার বাইরে এলে, আমার সাম্‌নে জিনিস পত্তর সব মিলিয়ে নেবেন। তাতে দোষ কি? মা ঠাকৃরুণেরা কি সন্তান-দের দেখা দেন না?"

বিনোদ বিপদে পড়িলেন। তাঁর ভরসা হইতেছিল, এই পেটারি স্বর্ণরৌপ্যে পরিপূর্ণ। কেন সরলাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন! কিন্তু এখন তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আনা ত সহজ কথা নহে। ঠাকুর ইচ্ছা করিয়া আবার একটু গরম হইলেন। কেন না, নরমে কার্য্যো-দ্ধারের উপায় দেখিলেন না। বলিলেন, "জিনিস পত্তর বুঝিয়ে দিতে হয়, আমাকেই দিয়ে যাও। ভদ্রলোকের বউ কি করে তোমার সুমুখে বার হবে? কে তুমি? চুরীর জিনিস নিয়ে এসেছ, সুড়্‌সুড়্ করে দিয়ে পালাও। তোমার এত ন্যায়ে কাজ কি?"

আগন্তুক আবার হাসিল। একটু চুপি চুপি বলিল, "ঠাকুর, তিনি বাড়ীর ভেতর সত্যি সত্যি আছেন ত ? না তাড়িয়ে দিয়েছ ?"

এ লোকটা কি অন্তর্য্যামী না কামচর ? বিনোদ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অপ্রতিভ হইয়া আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক বলিলেন, "বাপু; স্ত্রীপুরুষে কত ঝগড়া হয়, সে কথায় তোমার কি দরকার ? তুমি নিজের কাজ বাজিয়ে চলে যাও। স্ত্রীর ধন স্বামীর একথা জান ত ?"

সে অন্তর্য্যামী বা কামচর—যেই হোক্—সে দুঃখিত হইয়া বলিল,—"কি করেছ ঠাকুর ? মালক্ষীকে পায়ে ঠেলে তার সোণা রূপার লোভ সামলাতে পার্‌চ না ! কিন্তু তোমার দোষ কি ? দিন কাল এম্‌নি পড়েচে ! মা-মরা অনাথিনী, তুমি সোয়ামী, তোমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল, তাকে তুমি দূর করে দিলে ? এই কি ধর্ম্ম ঠাকুর ? আর পেটারিটি তার সঙ্গে থাক্‌লে তা কি পার্‌তে তুমি ? কিন্তু ঠাকুর, সেই মেয়েটির মন কত দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্যের ঠাঁই, তা একবার দেখলে না। মালক্ষীকে পায়ে ঠেলেছ !"

বিনোদবিহারী ভ্রান্তি দূর হইল। কথা বলিতে বলিতে আগন্তুক মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিয়াছিল, এবং তাহার দীর্ঘায়ত চক্ষুর জ্যোতি সে অন্ধকারেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিনোদ গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সম্মুখে এ যে ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবু !

বিশ্বনাথ বলিল, "ঠাকুর, চিন্‌তে পেরেছ কি ? সেদিন জগতির ঘাটে ডাকাতের টাকার ওপর তোমার ঘৃণা দেখে তোমার ওপর আমার ভক্তি হয়েছিল। কিন্তু দেখচি তোমাদের ধর্ম্ম কেবল মুখে, কেবল লোক-দেখানো ; ছি ঠাকুর, মালক্ষীকে আমার পায়ে ঠেলেছ ! আমি তাঁর চরণে এই পেটারি পৌঁছে দেব, যেখানেই থাকুন তিনি ! বিশে যাকে মা বলেচে, তার আবার দুঃখু কি ঠাকুর ?"

বিশ্বনাথ সেই পেটারি মাথায় লইয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত লইল ! বিনোদ

নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া সেই গৃহান্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভয়ে, বিস্ময়ে তাঁর পা উঠিতেছিল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিক্রম সিংহের ছেলেরা সে রাত্রে গৃহে ফিরিল না। অন্য সময়ে ইহাতে একটু চিন্তার কারণ হয় বটে, কিন্তু ডাকাইতির হাঙ্গামায় মীরা ভাবিবার সময় পায় নাই। প্রাতেও তাহাদের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। সরলা সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে বিদায় হইয়া গেল। দু' চারি দিন থাকিতে অনুরুদ্ধ হইলে মীরাকে হাসিয়া বলিল, "দিদি, আমার সত্‌সতীনের ঘর, পথে আর দেরি করা ভাল হয় না। ভাইদের বিয়ের সময় আমায় মনে করো দিদি, তখন অবিশ্যি আস্‌বো; তোমাদের উপকার কখন ভুলব না।" সরলা বিস্তর আপত্তি করিলেও মীরা পথের আহার্য্যাদি দিতে ছাড়িল না।

বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পরিহার গ্রামে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। সিংহ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রটি গত কল্য সন্ধ্যার সময় এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিষম আহত হইয়া নিশীথে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। খাটুলিতে শব আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র আসে নাই। ব্যাঘ্র নিহত না হইলে সে গৃহে ফিরিবে না। মীরা শোকে অধীর হইয়া উঠিল, কিন্তু বিক্রম সিং বাহিরে অন্তত অটল রহিলেন। অনুচরদের ডাকিয়া বলিলেন, "মেয়ে ছেলের মত কাঁদিলে কি হবে? হয় যুদ্ধে নয় শীকারে রাজপুতের ছেলে ত মরিবেই! দুষ্মন এখনও বনে বেঁচে! তোমরা এখুনি উদ্যোগ করে আমায় নিয়ে চল। আমি সেই পুত্রঘাতীর রক্ত দেখে পুত্রশোকের জ্বালা নিবারণ করব। স্বহস্তে সেই বাঘ না মেরে আমি জলগ্রহণ করব না।"

শুনিয়া মীরা পিতার পদতলে আসিয়া পড়িল। ভাইগুলিকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, তাহার শোকের অবধি ছিল না। তথাপি ক্ষণেকের জন্য চিত্ত স্থির করিয়া সে পিতৃচরণে ভিক্ষা করিল, যাহা বিধাতার মনে ছিল তাহা হইয়াছে। তিনি আর সে বিপদে যেন না যান; তার মন বলিতেছে, তিনিও বুঝি নিরাপদে ফিরিতে পারিবেন না। বিক্রম মীরার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমায় স্ত্রীলোকের মত কাঁদাস্‌নে বেটী!" তার পর সদলে শীকারে বাহির হইয়া গেলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিহার হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে বিখ্যাত বাগ্‌দেবীর খালের ধারে হোড়ঙ্গের বিস্তৃত বন। বন নাতিবৃহৎ বৃক্ষগুল্মাদিতে আচ্ছন্ন এবং এরূপ ঘনবিন্যস্ত যে, সূর্য্যরশ্মিও তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ইহার এক প্রান্তে স্বরূপগঞ্জ যাইবার পথে বিশ্বনাথের একটি আড্ডা ছিল; খালের ধার হইতে সুড়ঙ্গপথে তাহার পথ। সে কালে ডাকাইতদের লোক ছাড়া সাধারণে তাহা জানিত না।

এই জঙ্গলের অন্য প্রান্তে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে বিক্রমসিংহের পুত্রেরা শীকার করিতে আসিয়াছিলেন। যে শাল্মলীতরুমূলে দিগম্বর বাঘের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আহত হন, সঙ্গীরা সন্তপ্ত বৃদ্ধকে সে স্থান দেখাইয়া দিল। পীতাম্বর সমস্ত রাত্রি সেখানে অপেক্ষা করিয়া প্রভাতে আবার ভ্রাতৃহন্তার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত—বেলা তখন দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তখনও তাহার কোনও সংবাদ নাই। বিক্রম সিং চারি দিকে লোক পাঠাইয়া, স্বয়ং স্বরূপগঞ্জের মুখে মনুষ্যসমাগমচিহ্ন-মাত্রশূন্য অপথে চলিলেন। লতাগুল্মসমাকীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ বনদেশে

চিরদিন তিনি সানন্দে বিচরণ করিয়াছেন। আজ জীবনের শেষ বেলায়, পুত্রশোকবিহ্বল, পুত্রশোকপ্রতিবিধিৎসু বৃদ্ধ অবলীলাক্রমে সে সব অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন। নিতান্ত দুর্গম স্থানে তরবারি ব্যবহারের প্রয়োজন হইতেছিল। এইরূপে প্রায় দুই ক্রোশ পথ মুক্ত করিয়া বিক্রম সিং এক সুদীর্ঘ তিন্তিড়ী বৃক্ষের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। বৃক্ষশাখা হইতে মনুষ্যের আর্ত্তকণ্ঠস্বর তাঁহার কাছে ব্যাকুলভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে,—"সিংহীমোশাই গো, আমাকে বাঁচাও!"

বিক্রমসিং বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে মনে হইল,—এ ভ্রম; কিন্তু সেই আর্ত্তকণ্ঠ আবার পূর্ব্ববৎ ধ্বনিত হইল। বিক্রম বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, উর্দ্ধে এক প্রকাণ্ড শাখায় একটা মনুষ্যদেহ কে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তিনি ব্যথিত হইলেন। কৌতুহলী হইয়া সুধাইলেন, "কে তুমি? কি দোষে, কে তোমার এ দুর্দ্দশা করেছে? যদি ঠিক্ কথা বল, আমি তোমার বাঁধন খুলে দেব।"

আর্ত্ত ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে জানাইল যে, বেশী কথা সে বলিতে অক্ষম। কাছে গেলে বলিতে পারে।

বিক্রম সিং একটু ইতস্তত করিয়া বৃক্ষারোহণ করিলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, গত রাত্রের ক্ষুদ্র ডাকাইত দল যাহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির এই দুরবস্থা। বৈদ্যনাথের চক্ষু দিয়া অবিরল ধারা পড়িতেছিল। বৃদ্ধকে কাছে দেখিয়া বলিল,—"আমার প্রাণ বাঁচাও। আর কখন আমি টাকার লোভ করব না। গুরুর দিব্বি, আর কখন ডাকাতি করব না। গোয়ালার ছেলে দুধ দই বেচে গুজরাণ করব। দোহাই তোমার সিংহী মশায়! বাঁচাও আমাকে। হাত খোলা নেই যে, তোমার পায়ে ধরব!"

বিক্রম আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমার এ দশা করিল? বিশ্বনাথ? তার কি কোনও ভৌতিক বল আছে? এর মধ্যে কেমন করে তোমার দেখা পেলে?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কপাল! নইলে ধর্ম্ম-বাপ হয়ে একটু দয়া করলে না? ভয়ে আমি আস্তানায় লুকিয়ে ছিলাম—ভোরে পালিয়ে যাব। কিন্তু সেই রাত্রেই আমায় ধরবে, কে জান্‌ত? তার পর মায় বামাল ধরে আমার এ দশা করেছে। সূর্য্যি উঠিতে না উঠিতে বেঁধে রেখে গেছে, এখনও এলো না। হয় ত এম্‌নি করে খেতে না দিয়ে মেরে ফেল্‌বে! সিংহি মশায়! ছেরোকাল বিনি মাইনেতে তোমার চাকর থাক্‌ব। বাঁচাও আমাকে, শীগ্‌গির আমায় খুলে দাও, নইলে আড্ডা কাছে, আবার এলো বলে। তার যত দয়া, তত রাগ।"

বিক্রম সিং বৈদ্যনাথের বন্ধন সকল কাটিয়া দিলেন। বলিলেন, "তুমি অতি গর্হিত কাজ করেছিলে! কখ্‌খন আর এমন করো না। যদি বিশু তোমায় আবার ধরে, আমার নাম করো।"

তখন বৈদ্যনাথ কষ্টে নামিয়া আসিল! কঠোর বন্ধনের দাগে দাগে বেত্রাঘাতবৎ ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। বিক্রম তাহাকে ধরিয়া জলাশয়ের দিকে চলিলেন। বাগ্‌দেবীর খাল সেখান হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। নিকটে অন্য জল ছিল না।

জলে নামিয়া বৈদ্যনাথ আকণ্ঠ পুরিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল। স্নান করিয়া অনেকটা সুস্থ হইল। বিক্রম সিং আবার স্বকার্য্যে অগ্রসর হইবেন ভাবিতেছেন, কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন স্থির করিতে পরিতেছেন না। এমন সময়ে সেই নিস্তব্ধ বনদেশ কম্পিত করিয়া অদূরে উত্যক্ত ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বিক্রম সিং বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। শব্দানুসরণ করিয়া উন্মুক্ত অসিহস্তে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই শার্দ্দূলগর্জ্জন খালের অপর তীরে প্রতিধ্বনিত হইতে না হইতে বৈদ্যনাথ ডুব দিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিক্রম সিং যে অবস্থায় শীকারের সাক্ষাৎ পাইলেন, তাহা ভয়ানক। খালের ধারে নিবিড় ঝোপের ভিতর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র—সম্মুখে সদ্যোহত বিপুল ষণ্ড-দেহ পড়িয়া আছে, তাহার মাথার উপর প্রকাণ্ড বট গাছের উচ্চ শাখার অন্তরাল হইতে কে তাহার প্রতি তীরের উপর তীর সন্ধান করিতেছে। ঝোপ এরূপ ঘনবিন্যস্ত যে, ঠিক সম্মুখে লক্ষ্য স্থির হইতেছে না। পার্শ্বের ছিদ্রপথে শরচালনা করিয়া বাঘটাকে উত্যক্ত করাই শিকারীর প্রথম উদ্দেশ্য। এইরূপে সে বাহিরে আসিলে শর এবং গুলি বর্ষণের সুবিধা হইবে। কিন্তু ব্যাঘ্র স্বস্থান হইতে নড়িতেছিল না। তীর সকল তাহার বাসগৃহের ভিতর পড়িতেছিল বটে, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহাতেই তাহার একান্ত শোণিতপানানন্দে বিঘ্ন ঘটিতেছিল। সেই জন্য ব্যাঘ্র রোষভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল।

শরসন্ধায়ীকে বিক্রম দেখিতে পাইতেছিলেন না, কিন্তু সে তাঁহাকে চিনিয়া প্রমাদ গণিল। বৃক্ষশাখার সেই অন্তরাল হইতে পীতাম্বর হাঁকিল—"বাবুজি, হুঁসিয়ার, এখন শীকারের সম্মুখে যাবেন না!" কিন্তু বিক্রম ব্যাঘ্রের নিতান্ত নিকটে ও সামনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন—কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বনের স্পৃহা তাঁহার ছিল না, তখন আর সে উপায়ও ছিল না। ব্যাঘ্র তাঁহাকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক লম্ফে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। বিক্রমও চকিতে পিস্তল ছুড়িলেন। লক্ষ্য তেমন স্থির হয় নাই, গুলি বাঘটার কর্ণচ্ছেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন সে ভীষণতর হইয়া বিক্রম সিংহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পীতাম্বর পিতার এই সঙ্কটাবস্থায় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—বন্দুক উঠাইয়াও গুলি করিতে পারিল না। এ দিকে বৃদ্ধ অসিচালনার অদ্ভুত কৌশলবলে বাঘটার সম্মুখের এক টাপা অকর্ম্মণ্য করিয়া দিলেন বটে, কি

অন্যটার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ব্যাহত করিতে পারিলেন না। তাহার ফলে স্বয়ং মস্তকে দারুণ আহত হইলেন। তিনি তাহার কবল হইতে আত্মদেহ মুক্ত করিয়া দ্বিতীয় বার অসি চালনা করিবার পূর্ব্বে পীতাম্বরও ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠদেশে গুলিবর্ষণ করিল। তাহাতে মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইল বটে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। সে বিক্রম সিংহের মস্তকের উপর আপনার ব্যাদিত মুখগহ্বর স্থাপিত করিল। বিক্রমের অসিফলক উদর বিদ্ধ করিলেও সে মুখের গ্রাস ত্যাগ করিল না। বৃদ্ধ দেখিলেন, মুহূর্ত্তে তিনি ব্যাঘ্রমুখে চূর্ণিত হইয়া যাইবেন। পীতাম্বর বৃক্ষ লইতে দ্রুত অবতরণ করিতেছিল বটে, কিন্তু নিজেই বুঝিল, তাহার দ্বারা কোনরূপ সহায়তা লাভের পূর্ব্বে পিতা ব্যাঘ্রমুখে প্রাণত্যাগ করিবেন। এমন সময়ে কাহার নিক্ষিপ্ত শরে মস্তিকের ঠিক্ সন্ধিস্থানে বিষম আহত হইয়া অকস্মাৎ ব্যাঘ্র ভূপতিত হইল। তাহার বিপুল দেহভার মস্তকে লইয়া বিক্রম সিংহও পড়িয়া অজ্ঞান হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পীতাম্বর বৃক্ষশাখা হইতে বেগে লাফাইয়া পড়িল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, মৃত ব্যাঘ্রের শিরে যে তীর সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাই তাহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। পীতাম্বর বাঘটার মুখগহ্বর হইতে পিতার মস্তক বিমুক্ত করিল বটে, কিন্তু তাহার বিপুল দেহভার অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্থান চ্যুত করাও তাহার সাধ্যাতীত। তথাপি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ছাড়িল না। এই সময়ে শিকারীর বেশে কেহ উর্দ্ধশ্বাসে সেখানে দৌড়িয়া আসিল।

পীতাম্বর তাহাকে চিনিতে পারিল না। কিন্তু সে ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয়ের মত তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া মৃতব্যাঘ্রদেহ স্থানান্তরিত করিতে সহায়তা করিল। তার পর বিক্রম সিংহের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার মৃগয়াবেশ খুলিয়া ফেলিল। পীতাম্বর আগন্তুকের উপদেশে উত্তরীয় ভিজাইয়া আনিয়া পিতার মুখে চোখে জল সিঞ্চিত করিল। বিক্রম সিংহ দারুণ আহত হইয়াছিলেন, মস্তক হইতে অবিশ্রান্ত শোণিতপাত

হইতেছিল। সেই অবসরে সে ঔষধ সংগ্রহের জন্য ছুটিয়া চলিয়া গেল। পীতাম্বরকে বলিল—"কোন চিন্তা করো না। এমনি করে খুব জল ঢাল। আমার ফিরিতে দেরি হবে না।"

সেই অপরিচিত, তার পর এক দণ্ডের ভিতর খাটুলি ও চারি জন বাহক সঙ্গে করিয়া আনিল। ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিল, স্বহস্তে ক্ষতস্থান-সমূহে লেপন করিয়া দিল। বাহকদের সাহায্যে বিক্রম সিংহের দেহ খাটুলিতে স্থাপিত করিয়া আদেশ করিল, "আড্ডায় নিয়ে যা।"

পীতাম্বর অপরিচিতের এই সৌজন্য এবং আত্মীয়তায় মুগ্ধ হইল। খাটিয়া চলিয়া গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু কাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার কেমন বাধ-বাধ করিতেছিল!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পীতাম্বর সেই অপরিচিত গৃহে গৃহস্বামীর আতিথ্যসৎকারের সুব্যবস্থায় মুগ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে অনুচরেরা সে গৃহ আহার্য্য সামগ্রীতে পূর্ণ করিল। সেই জনমানবশূন্য বনের মধ্যে তাহারা যেরূপ অনায়াসে এবং সত্বরতার সহিত প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন করিতেছিল, যথার্থই তাহা বিস্ময়কর। সে গৃহের গঠনপ্রণালীও বড় বিস্ময়জনক। নিতান্ত নিকটে আসিয়াও পীতাম্বর প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে, সেখানে মনুষ্যের বাসগৃহ থাকিতে পারে। অথচ গৃহ সকল তেমন ক্ষুদ্র বা অপরিষ্কৃত নহে। বিস্মিত পীতাম্বর ভাবিতেছিল, এটা বুঝি একটা প্রেতপুরী!

গৃহস্বামী সমস্ত দিন বিক্রম সিংহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল! তাহার নির্দ্দেশ মত পীতাম্বর অজ্ঞান পিতার মুখে ধীরে ধীরে দুগ্ধ ও সরবৎ সিঞ্চিত করিতেছিল। একটু অবকাশ পাইলেই গৃহস্বামী অন্তর্হিত হইতেছিল—

কিন্তু কোথায় যাইতেছিল, পীতাম্বর তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। সুড়ঙ্গপথের কোনও সংবাদ জানার সম্ভাবনা ছিল না।

বিক্রম সিংহ যখন চক্ষু মেলিলেন, তখন অপরাহ্ণ হইয়া গিয়াছে। পীতাম্বরকে দেখিয়া তিনি সুধাইলেন, "এ আমায় কোথায় এনেছ? বাঘটা আমায় খেয়ে ফেলেছে, স্বপ্নে এই মনে হচ্চিল। কে আমায় তার মুখ থেকে বাঁচালে?" এমন সময়ে গৃহস্বামী আসিয়া পদতলে দাঁড়াইল। পীতাম্বর সজলনেত্রে তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল—কথা কহিতে পারিল না। এবং তাহার তখনকার মনের ভাব বাক্যের অতীত! সেই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দেখিয়া গৃহস্বামী মুখ নত করিল। একটু একটু লজ্জিত হইয়া পীতাম্বরকে বলিল, "তুমি আমায় পর মনে করচো কেন? তুমি যেমন ওঁর ছেলে, আমিও তাই!"

বিক্রম সিংহ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে স্পষ্ট চিনিতে পারিতেছিলেন না। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বলিলেন—"কে বিশ্বনাথ? বদেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তাকে এবারটা মাপ করো। সে বলে, তোমার যত দয়া, তত রাগ! আমাকে কি তোমার আড্ডায় এনেছ? এ যাত্রা আমার রক্ষে নাই। আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চল! ঐ দেখ, দিগু আমার জন্যে অপেক্ষা করচে।"

পীতাম্বর বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ বলিল, "ভয় কি? আঘাত তেমন বেশী নয়। যে ওষুধ দিইচি, তাতেই সেরে উঠবেন। কতবার আমি বাঘের কামড় থেকে এই ওষুধের গুণে বেঁচে উঠেছি!" বৃদ্ধ মৃদু হাসিলেন। "তোরা বালক, আর আমি বুড়া! তোদের এক ফোঁটা রক্ত ক্ষয় হয়, দশ ফোঁটা বাড়ে। আমার কি তাই বিশু! রক্ত-স্রাবে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েচি। ধন্বন্তরি আমায় বাঁচাতে পারেন না। নিজের শরীর আমি বুজ্‌চি। তোমরা আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চল। আমার জনমদুঃখিনী কন্যাকে খবর পাঠাও!"

মীরার কথা মনে করিয়া বিক্রম সিং অধীর হইতেছিলেন। পুত্রশোকের মর্ম্মাদাহন বিস্মৃত স্বপ্নের মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বিক্রম সিং ঠিক্ বলিয়াছিলেন। তিলে তিলে তাঁহার জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইতেছিল। গঙ্গাতীরে পিতৃগতপ্রাণা চিরদুঃখিনী কন্যার সঙ্গে যখন দেখা হইল, সে দৃশ্য অনুভব করা যায় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। স্বরূপগঞ্জের সন্নিকটে, বিশ্বনাথের আড্ডার অনতিদূরে, কন্যাপুত্রপরিবৃত হইয়া বিক্রমসিং গঙ্গাগর্ভে পরদিন মধ্যাহ্নে দেহত্যাগ করিলেন। বিশ্বনাথ ছেলেদের সঙ্গে ছেলের মত অধীর হইয়া কাঁদিল!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বদন বাগ্‌দী দিদি ঠাকুরাণীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইতে আসে নাই বটে, কিন্তু একটু দূর হইতে সে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। পূর্ব্ব রাত্রে ভগবান মদক বদনকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া সরলার কাছে সব কথা বলিয়াছিল। কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। বদন জয়দুর্গা ঠাকুরাণীর কাছে নানা রূপে উপকৃত এবং আশ্রিতগণের ভিতর তাঁহার বিশেষ স্নেহ-পাত্র ছিল। সে জন্য লোকে রহস্য করিয়া তাহাকে বলিত, "ঠাক্‌রুণের পুষ্যি পুত্তুর।" পরিহার হইতে যাত্রাকালে সরলা বাগ্‌দী চারি জনকে বিদায় দিতে চাহিলে, বদন মহা আপত্তি করিয়া বসিয়াছিল। আর তিন জন নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেল—কিন্তু বদন গেল না।

একটু একটু দিন থাকিতে বদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীটি দেখিয়া আসিয়াছিল। সরলা নিতান্ত দুঃখিনীর মত পদব্রজে, একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে সবে প্রথম শ্বশুরঘর যাইবে ভাবিতে, মা ঠাকুরাণীকে মনে করিয়া বদন চোখের জল মুছিল। দিদি ঠাকুরাণীর আজ্ঞায় নৌকায় রহিল

বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। বড় বউ যখন গলা জাহির করিয়া পল্লীগ্রামের শান্ত রাত্রিসমাগম কাঁপাইয়া তুলিতেছিল, সে তখন চোরের মত বাড়ীর প্রাচীরগাত্রে অন্ধকারমধ্যে লুকাইয়া ব্যাপারটা কত দূর গড়ায়, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে সহসা দেখিল, অন্ধকারে কে এক জন দীর্ঘ লাঠির মাথায় পেটারির মত কিছু একটা ঝুলাইয়া দ্রুতগতি বহির্বাটীর দিকে গেল। অনেকক্ষণ তাহার কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। শেষে বদন শুনিল, কে মুখুয্যে মোশাইকে ডাকাডাকি করিতেছে। বদন আর একটু অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। কেন না, সেখান হইতে সে আগন্তুকের সঙ্গে বিনোদের কথাবার্ত্তা সকলই শুনিল।

বিশ্বনাথ বাহির হইয়া গেলে বদন তাহার পাছে পাছে চলিল। ক্ষুদ্র গ্রাম, দেখিতে দেখিতে তাহারা শস্যপূর্ণ প্রান্তরে আসিয়া পড়িল। গ্রাম ইহার মধ্যেই প্রায় সুষুপ্ত—কেবল ভরানদীর কুলু কুলু রব স্পষ্টতর হইতেছিল।

বিশ্বনাথ এক স্থানে একটু অপেক্ষা করিয়া আর একখানি লাঠি খুঁজিয়া লইল। বদন বুঝিল, রণ্‌পায় উঠিলে কাহার সাধ্য এই দলপতির গতি অনুসরণ করে। সে সাহস সংগ্রহ করিয়া হাঁকিল, "মশাই গো, একটু দাঁড়াও। আমার কিছু কথা আছে।"

বিশ্বনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইহার মধ্যে বেতের ক্ষুদ্র পেটারিটি পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া লইয়া সে যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল।

বদন সম্মুখে আসিয়া "অবদান হই" বলিয়া করজোড়ে নমস্কার করিল, এবং আত্মপরিচয় দিল। পিছু ডাকায় যাত্রার অশুভ আশঙ্কা করিয়া বিশ্বনাথ একটু রাগিয়া উঠিয়াছিল, পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইল।

বিশ্বনাথ কহিল,—"তোমারি নাম বদন? ভগবানের কাছে সন্ধ্যার

একটু আগে তোমার কথা সব শুনেছি। আমি মা ঠাকুরাণীকে তাঁর পেটারিটি ফিরে দিতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখা পেলেম না। সত্যিই কি বিট্‌লে বামুন তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েচে?” কোথায় তিনি?”

বদন। একবার বুড়ীর কান্না শুন্‌তে পেয়েছিলাম। বোধ করি নৌকায় ফিরে গিয়েছেন। নিতান্ত অপমান না হলে আর তিনি ফেরেন নি। আমি কেবল মোশাইয়ের সঙ্গে কথা কইবার জন্যে আছি।

বিশ্ব। তা বেশ হয়েচে। তোমার দেখা না পেলে আমাকে নদীর ধারে ছুটে বেড়াতে হতো। মা কালী তোমাকে মিলিয়ে দিলেন। তা মা আমার ছেলেমানুষ, প্রথমে শ্বশুরঘর করতে এসে এমন মনকষ্ট পেলেন, আমি আজ্ আর দেখা করে তাঁর ক্লেশ বাড়াব না বদন। তা ছাড়া লোভিষ্টি বামুন হয় ত এখুনি টাকাগুলোর লোভে ছুটে আস্‌বে। এর মাঝে আমাদের থাকা ভাল নয়। পেটারিটি তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই। পথে আর কোন বিপদ হবে না। বদের আমি নাজেহাল করেচি। শুন্‌চি ব্যাটা কৃষ্টপুরের দিকে পালিয়েচে।

বদন বিশ্বনাথের হাত হইতে পেটারিটি লইল। দেখিল, আগের চেয়ে বেশী ভারী। হাসিয়া বলিল, “বাবু মোশাই, এত ভারী করে দিয়েচো! দিদি ঠাকুরুণ আমার বড় ধর্ম্মভীতু, পেটারি ছোঁবে কি না সন্দেহ। তোমার ধন তুমি ফিরে নাও বাবু মোশাই।”

বিশ্বনাথ মনে মনে বদনের প্রশংসা করিল। বলিল, “বদন, মা আমার ধর্ম্মভীতু, তা জেনেও কিছু আমি দিয়েছি। কিন্তু তাঁকে বলো, এ আমার ডাকাতির টাকা নয়। অমি দুচা’র বড় লোকের ঘরে কিছু কিছু মাইনেও পাই, এ সেই টাকা। নিতান্ত মা না নেন, টাকাটা তুমি নিও বদন। তোমার মতন ভাল লোক আমি বেশী দেখিনি।”

বদন হাসিল। “অত টাকা আমার হাতে এলে লোকে বল্‌বে চোর। তোমার আশীর্ব্বাদে মা ঠাক্‌রুণ আমাকে বেশ গুছিয়ে দিয়ে গেছেন

বাবু মোশাই। আর টাকায় আমার কাজ কি ? এখন দিদি ঠাক্‌রুণের একটা থিত্‌ভিত্‌ হলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পার্‌তাম্।”

এই সময়ে দূরে দুটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল। উভয়ে ঠাওর করিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। আয়ি বুড়ি রোদনের স্বরে বলিতেছিল—“এমন হলো কেন গো! নাতজামাই, তুমি এক দিনের ভার নিলে না ?” বদন বলিল—“ঐ দিদি ঠাক্‌রুণ। বুড়ি আসছে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে! পথভুলে ঘুর্‌চে বুঝি!”

বিশ্বনাথ কহিল—“আমি আর দাঁড়াব না বদন! মা যদি শ্বশুরবাড়ী আর না যান, তাঁকে নিয়ে যাও! বাড়ীতে থাক্‌তে না পারেন, নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে গিয়ে বাস করুন। আমি তার ব্যবস্থা করে দেব। মার মনের ভাব বুঝে তুমি ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ করে চলো। আমি এখন কাল্‌নার দিকে চল্‌লাম; শেষ রাত্রে ভগবানের সঙ্গে কথা কয়ে যাব! কিছু ভেবো না।”

তখন বিশ্বনাথ ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিশ্বনাথ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথের প্রথম জীবনাংশ তেমন সর্ব্বজনবিদিত নহে। আমরাও এ পর্য্যন্ত সে কথা কিছু বলি নাই। কিন্তু এখন বলিবার সময় হইয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম নদীয়া জেলার অস্থিমজ্জাগত। এই ধর্ম্ম ভিতরে বাহিরে ইহার সমাজযন্ত্রকে যেরূপ অনুপ্রাণিত করিয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত মহাপ্রভুর সে পবিত্র ধর্ম্ম এবং উহার আদর্শ অনেক স্থলে বিষম বিকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবি চণ্ডীদাস সখী রজকিনী রামীকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া যে মধুর রসে ভোর ছিলেন, নদীয়া সমাজ তাহার তরঙ্গাভিঘাতে যেমন প্রহত হইয়াছে, আর কোথাও তেমন নহে ইহার ফলে সর্ব্ব শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটা উদার সহানুভূতি এবং গূঢ় সংযোগের ভাব অন্তঃশিলা বহিয়া আসিতেছে; বাহিরের লোকের তাহা জানিবার উপায় নাই। এই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র এই যে, যত প্রকৃতি পুরুষ, রস তত প্রকার। এই ভ্রান্ত সংস্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতি এবং ধর্ম্মকে কলুষিত করিয়া তোলে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুই এক স্থলে ইহার প্রতিবাদ দেখিয়াছি। চণ্ডীদাস সম্প্রদায়ের এক প্রবীণা একবার আমায় বলিয়াছিলেন, "আমার স্বর্গীয় প্রভু বল্‌তেন,

গার্হস্থ্য এবং বিবাহিত স্বামী পত্নী ছাড়া ধর্ম্মসাধন হয় না।” মৃত স্বামীর কথা এই ভাবে বলিতে গিয়া বৃদ্ধার উজ্জল চক্ষে যে জল আসিয়াছিল, কখন তাহা ভুলিতে পারিব না।

প্রথম বয়সে বিশ্বনাথ এই সম্প্রদায়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অতি সংগোপনে স্বগ্রাম গাড়রাভাতছালা এবং পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহাকে মিলিত হইতে হইত। ইহার মধ্যে আসাননগরের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় পাঁচকড়ি সর্দ্দারের কন্যার সঙ্গে বিশ্বনাথের ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। এই ঘনিষ্ঠতায় বিকারের কোনও হেতু ছিল কি না, বলা যায় না; কিন্তু পাঁচকড়ি সর্দ্দার এক দিন নিশীথে বিশ্বনাথকে কন্যার গৃহে দেখিল, এমং ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিল। কুলকলঙ্ক-ভয়ে চোর বলিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত করিতে পারিল না। পাঁচকড়ি সর্দ্দার ভাগিনেয় মেগাইর সঙ্গে একত্র আসাননগরের অদূরবর্ত্তী নীলকুঠীতে পাইকের কাজ করিত। বিশ্বনাথকে বাঁধিয়া রাখিয়া সে ভাগিনেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেল। সেই অবকাশে কন্যা বিশ্বনাথের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল—মাতার অনুযোগ এবং পিতার নিষেধ গ্রাহ্য করিল না।

বিশ্বনাথ মুক্ত হইয়া সতর্ক হইল বটে, কিন্তু যে সখী নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, তাহার আর কোনও খবর পাইল না। কিছু দিন পরে গ্রামে খবর আসিল সর্দ্দারের কন্যা মেগাইএর গৃহে সর্পদংশনে মারা গিয়াছে। বিশ্বনাথ বুঝিল, আসল ব্যাপারটা কি। নিজেকে হতভাগিনীর অকালমৃত্যুর কারণ জানিয়া সে মর্ম্মাহত হইল। পাঁচকড়ি সর্দ্দার ও মেগাইর উপর জাতক্রোধ হইল।

ইহার ফলে বিশ্বনাথের জীবনে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাহার সকল সঙ্কল্প, সকল আশা ভরসা এক বিপরীত খাতে প্রবাহিত হইল। সে কালে ডাকাইতি একটা ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—যার যত লাঠির জোর, সে তত বড়লোক। বড় বড় জমীদারেরা

ডাকাতের দল পুষিয়া যুগপৎ আত্মরক্ষা ও শত্রুনির্য্যাতনের উপায়বিধান করিতেন। বিশ্বনাথ ক্রমে নিজে ডাকাইতের দল করিল। হণ্টার সাহেবের সংগৃহীত নামের তালিকায় নির্ভর করিতে পারিলে বলিতে হয়, নলদাহা, কৃষ্ণসর্দ্দার এবং সন্ন্যাসী, এই তিন জন বিশ্বনাথ বাবুর প্রধান অনুচর তাঁহার মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিত বলিয়া ঐ নাম পাইয়াছিল। নামটি নলদাহা নহে, নলডুবো! ইহার সম্বন্ধে নানা গল্প দিগ্‌নগর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, লোকটা দিগ্‌নগরের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকায় মাথায় কাল হাঁড়ি ধরিয়া ডুবিয়া থাকিত, এবং সুবিধামত সালঙ্কারা মহিলাদের কুম্ভীরবৎ আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলিত। শেষে একটা হিন্দুস্থানী পালোয়ান স্ত্রীবেশে জলে নামিয়া এই মনুষ্য-কুম্ভীর শীকার করে। তাহাকে লোহার পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দীঘির ধারে শিমুল গাছে ঝুলাইয়া রাখা হয়। সে খাঁচার লৌহ আজও শুনিতে পাই শিমুলতলায় বিরাজ করিতেছে। কেহ বলেন, নলডুবো বিশ্বনাথের একজন কালীর পাইক * ছিল, এবং সাতনলা দিয়া আশ্চর্য্য কৌশলে লোক মারিতে পারিত বলিয়া তার এত নামডাক; জলে ডুবে থাকার কথাটা অলীক। এই সংবাদদাতার মতে প্রথম বয়সে বিশ্বনাথের প্রধান অনুচর ছিল—পীতাম্বর ও বৈদ্যনাথ। ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ দল ছিল। খুব বড় জায়গায় ডাকাইতি করিতে হইলে তিন দল একত্র হইত।

ডাকাইত দলের অধিপতি হইয়া বিশ্বনাথ মাঝে মাঝে পাঁচকড়ি সর্দ্দারকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু ভাগিনেয় মেগাইএর সহায়তায় সে একরূপ অজেয় ছিল। উভয়ের মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিয়াছিল। পাঁচকড়ি নীলকুঠীর বলে বিশ্বনাথ এবং তার দলবলকে গ্রাহ্য

* কালীর পাক বা পাইক—প্রধান খেলোয়াড়,—ঘাঁটি রক্ষা ইহাদের কাজ।

করিত না। পাঁচকড়ি একবার কুঠীর টাকা লইয়া কৃষ্ণনগরে গেল। মেগাইকে কুঠীর কাজে একা রাখিয়া যাওয়ায় পীতাম্বর সুযোগ খুঁজিতে লাগিল, কিসে তাহাকে হীনবল করিতে পারে। শেষে মেগাইকে তাহার উপপত্নী-গৃহে পাইয়া ধরিয়া লইয়া যায়। চলিত গল্প এই যে, বিশ্বনাথ সদলে এক শত ঢাক বাজাইয়া দিবাভাগে এই মেগাই সর্দ্দারকে আসান নগরের নিকটবর্ত্তী পঞ্চাননতলায় বলি দিয়াছিল। পীতাম্বর স্বহস্তে ঘাতকের কাজ করিয়াছিল। মেগাই প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাকে চিৎ করিয়া কাটা হয়। সে প্রার্থনাও গ্রাহ্য হয় নাই। ফিরিবার সময় পাঁচকড়ি সর্দ্দার ঢাকের শব্দ শুনিয়া দূর হইতেই বিপদ বুঝিতে পারে। এবং বটগাছে ভাগিনেয়ের ছিন্নমুণ্ড ঝুলিতে দেখিয়া কঠোর শপথ করে, বিশে ডাকাতের দল নির্ম্মূল করিবে। সেই হইতে পাঁচকড়ি বিশ্বনাথের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সাহেবেরা তাহার দমন জন্য বদ্ধপরিকর হইলে, পাঁচকড়িই তাঁহাদের প্রধান সহায় হইল। জনশ্রুতি এই যে, জেলার মাজিষ্ট্রেট পাঁচকড়ির অধীনে বিস্তর সিপাই নিযুক্ত করিয়া দেন। প্রয়োজন বুঝিলে সে নিজেই ডাকাইতদের ফাঁসি দিতে পারিত।

এই জনশ্রুতি কতটা সমূলক, বলা যায় না। যাহা হউক, অনেক দিন পরে হঠাৎ একদিন মধ্যাহ্নে পাঁচকড়ির কাছে খবর আসিল, পীতাম্বর নিকটবর্ত্তী ঘোলাগাছি গ্রামে একটা স্ত্রীলোকের গৃহে নিদ্রা যাইতেছে। দেরিমাত্র না করিয়া পাঁচকড়ি সদলে সেখানে উপস্থিত হইল, এবং বাড়ীটি ঘেরিয়া ফেলিল। দীর্ঘ শূল্‌পি * হস্তে সে নিজে ঘরের চালে উঠিল, এবং চাল ফুটা করিয়া দেখিল পীতাম্বর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সেই ছিদ্রপথে শূল্‌পি প্রেরণ করিয়া, পাঁচকড়ি প্রথমে নিদ্রিত পীতাম্বরের বক্ষোদেশ ঈষৎ স্পর্শ করিল, এবং সে জাগিয়া উঠিলে বর্ষাফলক আমূল তাহার বক্ষে

* লম্বা বর্ষাবিশেষ।

বসাইয়া দিল। পীতাম্বর বলিল,—"মরা মানুষ মার্‌লি?" উত্তর—মেগাইকে কি জীয়ন্তে মেরেছিলি?" মৃত্যুর পূর্ব্ব যন্ত্রণা বড় অধিক হওয়ায় বিদ্ধ পীতাম্বর বলিয়াছিল,—শূল্‌পি বড় শূলুচ্চে!" প্রিয়তম ভাগিনেয়ের হত্যাকাণ্ড স্মরণ করিয়া পাচকড়ি কহিল—"এত দিনে আমার মেগাইয়ের শূলুনি কিছু কমিল!"

এই গল্প বৃদ্ধদের মুখে এখনও শোনা যায়। পাঁচকড়ির সহায়তা ব্যতীত বিশ্বনাথ কখনও ধরা পড়িত কি না সন্দেহ।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সে কালে হিন্দু মুসলমানের সখ্যভাবে মিলিবার মিশিবার কতকগুলি সুবিধা এবং স্থল ছিল। এখনও দূর পল্লীগ্রামে জাতীয় মহোৎসবের দিনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মহরমের সময় হিন্দু মুসলমানে এক হইয়া লাঠি-খেলার ধূমধাম আগেকার মত না থাক্, এখনও কিছু কিছু আছে। বিশ্বনাথের প্রথম অভ্যুদয়ের দিনে দিগ্‌নগর অঞ্চলে একবার মহরম উপলক্ষে এইরূপ খেলার "মেলা" হইয়াছিল।

সেই মেলায় দেশের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় সকল সমবেত হইয়াছিল। যশোলিপ্সু যুবকেরা দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া, হিন্দু মুসলমানের সেই সংযুক্ত বলবীর্য্যপরীক্ষায় যোগ দিয়াছিল। বিশ্বনাথ সে দিন অদ্ভুত বাহুবল ও ক্রীড়াচাতুর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে এক জন হইলেও অদ্বিতীয় হইতে পারিল না। বিশ্বনাথের বিশিষ্টতা কৌশলে যত, বলে তত নহে। সেই বিষম পরীক্ষার দিনে উহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছিল। বিশ্বনাথ অন্য সকলের উপর জয় লাভ করিল বটে, কিন্তু প্রেমচাঁদ ডোমকে পারিল না। সেই

সমবেত গণ্য খেলোয়াড়দের ভিতর একজনও প্রেমচাঁদের দেহে অস্ত্রস্পর্শ করাইতে পারে নাই; অথচ তাহার লাঠির কাছে কাহারও তরবারি টিকিল না। কেবল বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহার সমানে সমানে যুদ্ধ হইল। বিশ্বনাথ নিজে বুঝিল, বলে সে ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে, প্রেমচাঁদ হরিণ তাড়াইয়া মারিত; এম্‌নি তাহার বল ও দৌড়িবার শক্তি। কিন্তু চুরী ডাকাতিতে সে কখন যোগ দিত না।

সেই পরীক্ষার পর বিশ্বনাথ তাহার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিল। তার সঙ্গে খুড়া ভাইপোর সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিল। প্রেমচাঁদ বিশ্বনাথের বীরোচিত বিস্তর গুণে মুগ্ধ হইল বটে, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার দলে প্রবেশ করিতে সম্মত হয় নাই। শেষে মেগাইএর মৃত্যুর কিছু দিন পরে তাহার সর্ব্বপ্রধান কালীর পাইক হইল। ইহাতে কথা উঠিল, মেগাইএর পরিণাম দেখিয়া প্রাণভয়ে প্রেমচাঁদ বিশ্বনাথের দলে আসিতে সম্মত হইয়াছে। এখনও লোকে তাই বলে। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে, প্রেমচাঁদ কখনও জীবহত্যা করে নাই! সেই সুনাম ছিল বলিয়াই, গবর্মেণ্ট তাহাকে ধরিয়া দ্বীপান্তরিত করিয়াছিলেন, লট্‌কাইয়া বধ করেন নাই! বৃদ্ধ বয়সে দেশে ফিরিয়া প্রেমচাঁদ গঙ্গাতীরে মরিতে পাইয়াছিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই প্রেমচাঁদ ডোম এই ইতিহাসে ভগবান্ মদক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। মহাশয়েরা যদি কেহ "অজানত" তাহার দোকানের মিষ্টান্ন-গ্রহণকল্পনা করিয়া জাতি হারাইবার আশঙ্কা করেন, সেই জন্য বলিতেছি, ভয় নাই! ভগবান মিষ্টান্নোপজীবির বংশধর বটে। প্রেমচাঁদ তাহার

গুরুদত্ত নাম! এবং সে "বলরামসম্প্রদায়"-ভুক্ত বলিয়া লোকে তাহার "হাড়ি" বা "ডোম" উপাধি রটাইয়াছে।

ডাকাতের দলভুক্ত হইয়া ভগবান্ কেবল আর্ত্তের পরিত্রাণচেষ্টায় ফিরিত। লুটতরাজকে শারীরিক দণ্ডমাত্র পরিবর্জ্জিত করিয়া, নিতান্ত নিরামিষ রকমের করিয়া তোলে' এই তাহার সতত চেষ্টা। ইহাতে দলের কাহারও সঙ্গে প্রায় তাহার বনিত না। অথচ সকলই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। বিশ্বনাথ নিজে সকল রকম জুলুমের যম হইলেও ভগবানের মতে সায় দিতে পারিত না। হাসিয়া বলিত, "বাবা! যেখানে যেমন, সেখানে তেমন! ভেক নইলে ভিক্ষে মেলে কি?"

দলভুক্ত হইয়া পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে যে আত্ম-বিসর্জ্জনটুকুর দরকার, ভগবানের তাহা ছিল না। সকলকেই সে বিশ্বাস করিত, এবং কাহারও প্রতি একবার অবিশ্বাস হইয়া গেলে মনের ভাব রাখিয়া ঢাকিয়া চলিতে পারিত না। স্বগ্রাম আড়বান্দির সন্নিহিত কোনও স্থানের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ একবার ভগবান্‌কে আসিয়া ধরিল, বিশ্বনাথকে বলিয়া কহিয়া তাহাকে দলভুক্ত করিয়া লওয়া হউক। গুণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বেশ বলিষ্ঠ এবং লাঠি-খেলায় যথেষ্ট পারদর্শী। ভগবানের অনুরোধ শুনিয়া বিশ্বনাথ বলিল, "খুড়ো, বামুনের ছেলে ডাকাতি কর্ত্তে চায়, ব্যাপারখানা কি বাপু? লোকটাকে ভাল করে জানিস্ তো? তোর বাপু সব্বাইকে বিশ্বাস! আগে আমিও ছিলাম তোর মতন! তাই বদে গোয়ালাকে ধর্ম্মপুত্তুর করে ভুগ্‌ছি!" কালীর পাইকেরা ব্রাহ্মণের বল ও অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা শেষ করিয়া তাহাকে দলপতির কাছে লইয়া আসিল। বিশ্বনাথ ঠাকুরটিকে অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। সহসা দূরে একটা ষাঁড় চরিতে দেখিয়া, ব্রাহ্মণের হাতে এক শাণিত তর-বারি দিল। বলিল, "ঠাকুর! ছুটে গিয়ে ষাঁড়টাকে কেটে এস দেখি, কেমন তোমায় বল শক্তি!" দ্বিজপুত্র তাহাতেই প্রস্তুত, মালকোঁচা

মারিয়া সশস্ত্র ছুটিয়া চলিলেন। বিশ্বনাথের ইঙ্গিতে দুই জন তাহার পাছে ছুটিল, এবং ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিল। বিশ্বনাথ ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ্‌লি বাপু! তুই কেমন মানুষ চিনিস্!" ব্রাহ্মণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "ওরে, ঠাকুরটোর কান মোলে তাড়িয়ে দেত! ওর কোন ধর্ম্মজ্ঞান নেই।"

দিগ্‌নগরের চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের বাড়ীতে চিঠি পাঠাইয়া বিশ্বনাথ একবার ডাকাইতি করিতে যায়। ভগবান জানিত, এই পরিবার সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানপ্রিয়। বিশুকে সে গৃহে দস্যুতা করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু কথা থাকিল না। ভগবান সে দিনকার ডাকাইতিতে যোগ না দিয়া দিগ্‌নগরের বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল। এ দিকে যথাসময়ে ডাকাইতি পড়িল! অকস্মাৎ গৃহের এক প্রান্তে যন্ত্রণার চীৎকার শুনিয়া, বিশ্বনাথ স্বয়ং লুণ্ঠনত্যাগ করিয়া সেই দিকে ছুটিয়া গেল। মশালের আলোকে দেখিল, বৈদ্যনাথ আলুলায়িতকুন্তলা, রুধিরাপ্লুতা জননী ক্রোড় হইতে চারি বৎসরের শিশুকে কাড়িয়া লইতেছে; সম্মুখে কূপ দেখাইয়া বলিতেছে, "চাবি না দিস্, ছেলেটাকে এই কূয়ায় ফেলে দেব।" সেই বিপন্না মাতৃরূপে বিশ্বনাথ শৈশবকালের ক্রীড়াসঙ্গিনী প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণতনয়াকে সহসা চিনিতে পারিল। বৈদ্যনাথ একটু আগে পৃষ্ঠদেশে দুই স্থানে তরবারির গুরুতর আঘাত করিলেও, মাতা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রাণপণে সন্তানকে ক্রোড়ে রক্ষা করিতেছেন! আলুলায়িতকুন্তলে শোণিতসিক্ত অসংযমিত বস্ত্র মধ্যে অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য মধুর অপত্যবাৎসল্যে অপূর্ব্ব মোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। দেখিয়া বিশ্বনাথের হৃদয় মথিত লইল! শৈশবে এক দিন তার দিদিঠাকৃরুণ অন্নপূর্ণা দেবী আপনার পালিত এক মাতৃহীন ছাগশিশুকে বলিদান হইতে ঠিক্ এম্‌নি ভাবে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই ছাগশিশুর বলির সময় বিশু করতলে চক্ষু ঢাকিয়া গ্রামের ঠাকৃরুণতলা হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গিয়াছিল—সে অনেক দিনের কথা

অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল। ক্ষোভে রোষে বিশ্বনাথ প্রচণ্ড বেগে বৈদ্যনাথের প্রতি ধাবিত হইল, এবং ধাক্কা দিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল। বলিল,—"ওরে! তুই কি মার পেটে জন্মাস্‌নি? ছোট ছেলের কি অপরাধ? আমার সামনেই এই, না জানি অসাক্ষাতে তুই কি জুলুম না করিস্?" সহসা বজ্রগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইল, "গুড়াও।" মুহূর্ত্তে লুণ্ঠনপর ডাকাইতদের যে যেখানে ছিল, বহির্দ্বারে ছুটিয়া চলিল এবং দলপতির অপেক্ষায় সারি দিয়া দাঁড়াইল। সে অবকাশে বিশ্বনাথ সেই মাতৃস্বরূপিণী দেবীপ্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। বলিল, "দিদিঠাকৃরুণ, আমায় চিন্‌তে পার কি? আমি জান্‌তাম, তোমার বিয়ে হয়েছে, শান্তিপুরে। এখানে, ত' জান্‌তান না। জান্‌লে কখন বিশু হ'তে তোমার শ্বশুরবাড়ীর কোনও অনিষ্ট হত না। কিন্তু যা হয়ে গেল, তার আর চারা নেই। দিদি! বিশুর দোষ নিও না। এখন তোমার কি উপকার কর্‌তে পারি দিদিঠাকৃরুণ?" বিশ্বনাথ বস্ত্রমধ্যে রক্ষিত বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দিদিঠাকৃরুণের পদতলে রাখিল, এবং পুনরায় সজল-নেত্রে তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল।

পথে দলের লোকদের বিদায় দিয়া, বিশ্বনাথ ক্ষুব্ধমনে ধীরে ধীরে ভগবানের কাছে গেল। সে রাত্রের ঘটনা একে একে তাহার কাছে বলিতে বলিতে বিশ্বনাথ অশ্রুমোচন করিল। বলিল, "খুড়ো আজকের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আমার দলে আমার নামে এমন কত দৌরাত্ম্য হয়, কে জানে? কি ছাই ব্যবসাই কর্‌চি। মনে হচ্ছে, এ পাপ ছেড়ে দিয়ে চাষবাস করে খাই।" বিশ্বনাথের সেদিনকার শ্মশান-বৈরাগ্য স্থায়ী হয় নাই; কিন্তু তাহার ফলে ভগবান্ দস্যুদল ত্যাগ করিল। বিশ্বনাথের একান্ত অনুরোধ অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, শেষে গোবর-ডাঙ্গার হাটের উপর কিছুকাল দোকান করিয়া থাকিতে সম্মত হইল।

ভগবানের স্ত্রী ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল। কন্যাটিকে সে নিজেই

মানুষ করিয়াছিল, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। নিশ্চিন্ত হইয়া গঙ্গাতীরে হরিনাম করিবার ভরসায় ভগবান্ অগ্রহায়ণ মাসে মেয়ের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিল। বিশ্বনাথও তাহাকে সেই পরমর্শ দিয়াছিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

খাল পার হইয়া বৈদ্যনাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিল। বাঙ্গোবীর খাল হইতে কৃষ্ণপুর অনেক দূর। দলপতির হাতে পড়িবার ভয়ে সে বাঁকা পথে বন জঙ্গলের অন্তরালে পলায়নপর শৃগালের মত লুকাইয়া চলিল। আপনার কথা যে রাখিতে পারে না, অন্যের অঙ্গীকারাক্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করা তাহার পক্ষে শক্ত। বৈদ্যনাথ বিক্রম সিংহের কাছে অভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তার উপর তেমন ভরাভর করিতে পারিল না। বাড়ী গিয়া সে নিজের বিশ্বস্ত গোয়েন্দাকে বিশ্বনাথের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য পাঠাইল। দুই দিন পরে গোয়েন্দা আসিয়া বিক্রমসিংহের মৃত্যুসংবাদ দিল,— দলপতির কথা বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না।

ইহাতে বৈদ্যনাথ শঙ্কিত হইল। সে স্থির জানিত, ফের বিশ্বনাথের হাতে পড়িলে তাহার আর রক্ষা নাই। এ বাঙ্গলা মুলুকে পলাইয়া তাহার হাতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। চিত্তের ব্যাকুলতায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সে বিশ্বনাথের শত্রুপক্ষের আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিল।

ধর্ম্মপুত্র বলিয়া বৈদ্যনাথ দলপতির ঘরের বাহিরের যত খবর জানিত, আর কেহ তত নহে। পাঁচকড়ি সর্দ্দারের তাহা জানা ছিল। সে বৈদ্যনাথকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিল।

দুর্গোৎসবের আর দেরি নাই। পূজার কয় দিন গরিব দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান এবং দস্যুগণের চিরন্তন প্রথা মত বিজয়া দশমীর দিন সকল দলের

সম্মিলন উপলক্ষে মহোৎসব, বিশ্বনাথের জীবনে একটা প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইত। এবার কিছু টানাটানির মহল—অন্যান্য বছরের মত পূজার অনতিপূর্ব্বে লুট তরাজে তেমন মনঃসংযোগ করা হয় নাই। বিক্রম সিংহের মৃত্যুর পরদিন গোয়েন্দা আসিয়া বিশ্বনাথকে খবর দিল, বৈদ্যপুরের নন্দীবাবুরা তাঁহাদের কল্‌নার গদীতে সম্প্রতি দশ হাজার টাকা পাঠাইতেছেন। মেঘাকে সদলবলে নৌকাপথে পাঠাইয়া নিজে বিশ্বনাথ সরলার অনুসন্ধানে গেল। বদনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এইজন্য দলপতি কাল্‌নার অভিমুখে ছুটিয়াছিল।

সেখানে গঙ্গার অপরপারে ভরা ভাদ্রের খর স্রোত দূরে রাখিয়া কসাড়-বনাকীর্ণ চরের অন্তরালে মেঘা সদলবলে অপেক্ষা করিতেছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাহ্নবীর কল্ কল্ স্বন্ স্বন্ গতি-শব্দ ছাড়া আর বড় কিছু শোনা যায় না—ক্বচিৎ দূরে মৎস্যজীবীর উচ্ছ্বসিত আনন্দ-সঙ্গীতের শেষ তানটুকু বড় মধুর শুনাইতেছিল। এমন সময়ে দলের লোকে উৎকীর্ণ হইয়া শুনিল, রণ্‌পায় কেহ দ্রুত আসিতেছে। দলপতির আগমনপ্রতীক্ষায় সকলে সারি দিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু আগন্তুক ত দলপতি নহে। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, ভগবান্ মদক, মশালের আলোকে তাহার স্বেদসিক্ত মুখমণ্ডলে উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। বিস্মিত মেঘা কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ভগবান্ তাহার হাত ধরিয়া তফাতে লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ভগবান্ বৈদ্যনাথের শত্রুদলে প্রবেশের সংবাদ পাইয়াছে। এবং বিশ্বনাথকে অবিলম্বে সাবধান করা আবশ্যকর্ত্তব্য ভাবিয়া নিজে আসিতে দেরিমাত্র করে নাই।

প্রথমটা মেঘা ভগবানের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু অবিশ্বাসের স্থল ছিল না। শেষে মেঘা বলিল, "ময়রার পো, বিশু

বরাবর আমায় বলে আস্‌চে, বদে থেকে তার সর্ব্বনাশ হবে! দেখ্‌চি তাই হতে চল্‌ল; এখন উপায়?

পশ্চাৎ হইতে বিশ্বনাথ হাঁকিল—"উপায় মা কালী! যা করেন তিনি!" দূর হইতে মশালের আলো দেখিয়া বিশ্বনাথ নিঃশব্দে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এবং কসাড় বনের অন্তরালে দাঁড়াইয়া উভয়ের বিশ্রব্ধালাপ শুনিতেছিল।

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বিশ্বনাথ বলিল, "খুড়ো, অনেক দিন আমার মতে চলিস্ নি, আজ একবার চল্। বুঝতেই পার্‌চিস্ তো বাপের অন্তিম কাল উপস্থিত! গঙ্গাতীরে মুখাগ্নিটা করে যা।"

ভগবান বুঝিল, দলপতি আজিকার ডাকাতিতে যোগ দিতে অনুরোধ করিতেছে। বলিল, "বিশু! এ ছাই কাজ আজ আর নাই কর্‌লি! এখন থেকে একটু সাবধান হওয়াই ভাল! বড় মানুষগুলোকে আর ঘাটিয়ে কাজ নেই। শত্রু আর বাড়াস্ নে।"

বিশ্বনাথ বলিল, "তুই কি করতে বলিস? বদের ভয়ে কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে কাল্‌নার গাঙ্ থেকে ফিরে যাব?"

ভগবান্। বদের ভয়ের কথা বল্‌চি নে। কিন্তু এখন থেকে পাঁচকড়ি সর্দ্দারদের চাল চলনে রাত দিন আমাদের নজর রাখ্‌তে হবে। আচম্‌কা কলে ফেল্‌তে না পারে।

বিশ্বনাথ একটু ভাবিল। হাসিয়া বলিল, "খুড়ো! তোর কথাই ঠিক, কিন্তু আজকের দশ হাজারের লোভ সামলান বাগ্দীর ছেলের কর্ম্ম নয়। আমি বাপু আজ্ একটা গোঁয়ারতুমি করতে চাই। কিন্তু মেঘা

আর তুই ছাড়া হবে না! আরও দু একটা বাছা বাছা সড়কীওয়ালাকে নেব। বাকী সব কাল্‌নার গঞ্জে ছড়িয়ে থাক্‌বে।"

ভগবান্ চুপ করিয়া রহিল। মেঘা বেশী কথা বলে না, তথাপি কহিল, "চার জনে ইচ্ছা ক'রে বিপদে পড়তে যাওয়ার দরকার? ডাকাতি কর্‌তে হয়, দল নিলে চল। এ সহর কাল্‌না, ফাঁড়ি পুলিশের নাকের ওপর একটু হুসিয়ার হয়ে যাওয়াই ভাল। আর দশ দশ হাজার টাকা— বাবুরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে বিশু?"

দলপতি হাসিল। "মেঘু, নেব্‌বার আগে পিদিম একবার জ্বলে উঠে জানিস্ তো? আজ্ আমি অসাধ্যি সাধন করব। থাকে ফাঁড়া যাবে উত্‌রে। নবাব বাদসারা দরকার হলে এক এক বার ফৌজগুলোকে সাজিয়ে গুজিয়ে কাওয়াজ করায়, দেখিয়ে বিদ্রোহীদের ভয় দেখানর মত-লব। আমরাও আজ তাই কর্‌বো, কি বলিস্ খুড়ো? তুই যে বড় কথা কচ্ছিস্ নে?"

খুড়া বলিলেন, "বিশু, ধন্যি তোর সাহস! কিন্তু বাপু আমাকে এতে জড়াস্ নে। তুই ত জানিস্, প্রতিজ্ঞা করিছি ডাকাইতি আর কর্‌ব না।"

বিশ্ব। তোকে বাপু ডাকাতিতে ডাক্‌চে কে? আজ একবার হরিণের মত দৌড় দিতে হবে! পার্‌বি'নে তা?

ভগবান ঈষৎ হাসিল, কোনও উত্তর দিল না! তখন বিশ্বনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া মেঘার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিল।

প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। দারোগা মেহেরবান খাঁ আহারাদি করিয়া সুবাসিত তামাকু সেবন করিতেছিলেন—শয়নে যাইবার বড় দেরি নাই। সুকোমল শয্যায় অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া খাঁ সাহেব গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, আয়েস্ মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। একটু একটু নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইয়াছিল। সহসা কেহ আসিয়া তাঁহার বৈঠকখানার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কতকটা যোদ্ধৃবেশ,

অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় দারোগা সাহেব শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন ; চক্ষু মুছিয়া দীপালোকে দেখিলেন, সম্মুখে ভয়ানক মূর্ত্তি।

আগন্তুক দক্ষিণ হস্তে পিস্তল উঠাইয়া বামহস্তাঙ্গুলি ওষ্ঠে স্থাপন করিল। খাঁ সাহেব গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন—বুঝিয়া কোন গোল করিলেন না। তার পর আগন্তুকের ইঙ্গিত মত যে অবস্থায় ছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় এবং সেই বেশে তাহার সঙ্গে চলিলেন। পথে আর দুই ভীমমূর্ত্তি তাঁহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। অন্ধকারে অপথে মার্জ্জারকবলিত মুষিকবৎ "দারোগা সাহেব" কলের পুত্তলীর মত চলিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথ দিব্য নিরীহ বাবুটির মত নৌকায় বসিয়া ক্ষীণ প্রদীপালোকে লেখা পড়া করিতেছে। মাঝে মাঝে কুণ্ডলীকৃত আল্‌বোলার রৌপ্যমণ্ডিত নল অধরোষ্ঠে স্পর্শ করিয়া ঘোর বিষয়ীর মত চিন্তামগ্নের ভাব দেখাইতেছে। ভীষণমূর্ত্তি অপরিচিত তিন জন সেইখানে দারোগা সাহেবকে লইয়া গেল। সশস্ত্র অগ্রগামী ব্যক্তি বিশ্বনাথকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "হুকুম তামিল হয়েছে ; ইনিই দারোগা সাহেব।" বিশ্বনাথ দারোগা সাহেবকে আদর করিয়া বসাইল, এবং হিন্দীতে স্বাগতকুশল জিজ্ঞাসা করিল।

খাঁ সাহেব তখনও সামলাইতে পারেন নাই। এমন অভাবনীয় বিপদের ভিতর বিশ্বনাথের সমাদরটুকু কঠোর বিদ্রূপ বলিয়া মনে হইতেছিল। তিনি কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না।

বিশ্বনাথ দারোগার মনোভাব বুঝিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বিশে ডাকাতের নাম শুনে থাক্‌বেন। এ অধম সেই বিশে ডাকাত। সামান্য

একটু কাজের জন্যে, আপনাকে তখলিফ্ দেওয়া হয়েছে।" মেহেরবান খাঁ বঙ্কিমদৃষ্টিতে বিশ্বনাথের আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, ক্রোধ এবং উদ্বেগ সংযত করিয়া বলিলেন, "আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট বোধ করি কখন হয় নি। আমাকে এ ভাবে বেইজ্জত করার কি মতলব?"

বিশ্বনাথ বলিল, "ডাকাতিতে আইন ইজ্জত কিছুই ঠিক্ থাকে না। সেটা মাফ করবেন। অতি সামান্য কাজের জন্য আপনাকে আনা হয়েছে! আজ আমি নন্দী বাবুদের গদী লুট ক'র্‌র। আপনাকে তাহাতে একটু 'মদৎ' করতে হবে।"

বলিতে বলিতে বিশ্বনাথ নিজের সম্মুখবর্ত্তী বাক্স হইতে কাগজ বাহির করিয়া দারোগা সাহেবের সম্মুখে রাখিল। কলমদান সরাইয়া দিয়া বলিল, "কোন লোক জনের মদৎ নয়—কেবল একটু একরারনামা লিখে দেওয়া। লিখুন, এই ডাকাতি আপনার যোগ সাযোগে।"

কি সর্ব্বনাশ! দারোগা চক্ষু স্থির করিয়া বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পশ্চাতে কে বিকৃতকণ্ঠে হাঁকিল—"হুকুম তামিল করো জল্‌দি!"

খাঁ সাহেব করযোড়ে বিশ্বনাথকে বলিলেন, "শুনেছি আপনি গরীব দুঃখীর মা'বাপ। আমার ইজ্জৎ নিয়েচেন, চাক্‌রীটুকু নিয়ে কি আপনার লাভ হবে? এই একরারনামা লিখে নেওয়াও যা, আমার রুটি মারাও তা।"

বিশ্বনাথ বসিল। "এই একরারনামায় আপনার যদি চাক্‌রী যায়, আমি তার জবাবদিহি করব। আপনি কৈফিয়ৎ দেবেন, জোর করে আমি লিখে নিয়েচি। কেহ তা অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু সরকার বাহাদুর জান্‌বেন, যে লোকটার মাথা নেবার জন্যে তাঁদের ঘুম হচ্চে না, সে দারোগা সাহেবদের কাছ থেকেও একরারনামা আদায় করতে পারে।"

দারোগা তথাপি ইতস্তত করিতেছিলেন। পশ্চাতে আবার সেই বিকৃত কণ্ঠ তাঁহাকে শাসাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় নৌকা স্পন্দিত হইল। খাঁ সাহেব দ্বিরুক্তি না করিয়া একরারনামা লিখিলেন। যোদ্ধৃবেশী আর কেহ নহে, মেঘা স্বয়ং। সে দারোগার লিখিত ফারসী পড়িয়া বলিল, "হয়েছে!"

বিশ্বনাথ ভগবান্‌কে ডাকিল, এবং সে ছইয়ের উপর হইতে নামিয়া আসিলে বলিল, "খুড়ো, দারোগা সাহেব আমাদের অতিথি। তুমি তাঁর সেবা শুশ্রূষা কর। আজ্‌কের ব্যাপারে সেই তোমার কাজ। সময় হলে ওঁকে বিদায় দিও।" খাঁ সাহেব ভগবানের নজরবন্দীতে রহিলেন।

তখন তিনজনমাত্র অনুচর সঙ্গে বিশ্বনাথ প্রায় মধ্যরাত্রে নন্দীদের গদী লুট করিতে বাহির হইল। বিস্তর লোক আশে পাশে থাকিলেও চারিজনমাত্র গদীতে প্রবেশ করিয়া দশ হাজার টাকা উঠাইয়া লইয়া গেল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাল্‌নার ডাকাতির খবর অচিরে দেশময় রাষ্ট্র হইল। দেশের ধনকুবেরগণ ইহাতে অতিত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্বনাথের অনিষ্টকামনায় গোপনে গোপনে অনেকে রাজপুরুষদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্পষ্টত সেই দস্যুরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন, তখনকার অরাজক দিনে প্রায় কাহারও সাহসে ইহা কুলাইত না! কোম্পানি বাহাদুর নদীয়ার মাজিষ্ট্রেটের সিপাহীবলবৃদ্ধি করিয়া বিশ্বনাথ ও তাহার সহচরদের "গ্রেফ্‌তারির" জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। পাঁচকড়ি সর্দ্দার বৈদ্যনাথের কাছে দলের নাড়ীনক্ষত্রের সকলই জানিয়া লইল; কিন্তু সহসা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুজুরে তাহাকে উপস্থিত করিল না।

বিশ্বনাথের সর্ব্বত্র চর—এ সকলই তাহার গোচর হইল। মেঘা পরামর্শ দিল, এ অবস্থায় যে কোনও প্রকারে বৈদ্যনাথকে হত্যা করিয়া অনিষ্টবৃদ্ধি নিবারণ করা কর্ত্তব্য ; বিশ্বনাথ সদ্যোমৃত বিক্রম সিংহের অনুরোধ স্মরণ করিয়া জিহ্বা দংশন করিল। যাহা হউক, আড্ডাগুলি পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল অজ্ঞাতবাস অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব দলপতি নূতন নূতন আড্ডা গঠনের দিকে মন দিল। ইহার মধ্যে নাকাশিপাড়ার অদূরে ব্রাহ্মণীতলার নিবিড় জঙ্গল সর্ব্বপ্রধান। এই জঙ্গল কিয়ৎপরিমাণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। শোনা যায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের প্রাণরক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদের দরবারে যে তিন লক্ষ টাকা উপহার পাঠান, তাঁহার জমাদার ভৈরবনাথের সহায়তায় এই স্থানে তাহা লুণ্ঠিত হয়। এবং নাকাশিপাড়ার বাবুদের ভাগ্যলক্ষ্মীর বুনিয়াদ ইহাই। ভাগীরথী তখন এই বনের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে বহিয়া যাইতেন। সে বৎসর বিশ্বনাথ কাল্‌নার গদীর টাকায় ব্রাহ্মণীতলায় মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করিবার সঙ্কল্প করিল।

এই পূজার আয়োজন এরূপ সঙ্গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, বিশ্বনাথের শত্রুগণ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। তাহাদের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য বিশ্বনাথ স্বরূপগঞ্জের আড্ডার উদ্যোগ আয়োজন সমান রাখিল। বৈদ্যনাথ ধ্রুব জানিত, দলপতি যেখানে থাকুক, পূজার কয়টা দিন সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া সে স্বরূপগঞ্জের আড্ডায় কাটাইবে। সে খবর লইতে লাগিল, নদীয়ার কুম্ভকারেরা আসিয়া বাৎসরিক প্রথা মত প্রতিমা গড়িতেছে। তাহার সংবাদদাতা ভিখারীর বেশ ধরিয়া নিজে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, এবার জোড়া প্রতিমা! শুনিয়া কৃতঘ্ন মনে মনে হাসিল। ভাবিল, এবারে নবমীপূজার দিন যোড়া মহিষের সঙ্গে বিশের মাথাটা যদি কাটা না পড়ে, তবে মিছা তাহার গোয়েন্দাগিরি!

সুতরাং পাঁচকড়ি সর্দ্দার জেলার মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট্ সাহেবকে কৃত-

নিশ্চয় করিয়া আসিল, পূজার ছুটীর সময় সে দস্যু ব্যাঘ্রটাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া হুজুরে হাজির করিবে। সাহেব হাসিয়া "ইনাম" ও "তরক্কির" ভরসা দিলেন; এবং নিজে সে শীকারে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

স্বরূপগঞ্জের আড্ডা বিশ্বনাথের প্রিয় বাসস্থান। এখন যে প্রান্তরের এক পার্শ্বে নীলকুঠির বাঙ্গলো ঝাউ গাছের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে, তখন তাহা দুর্গম অরণ্যে আবৃত ছিল। এখন যে ভাগীরথী-খড়িয়ার সম্মিলন-ক্ষেত্র প্রায় দুই ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়া কালমাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেছে, তখন তাহা সেন রাজাদের ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদের ভিত্তিপাদমূল চুম্বন করিত। বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা, তপের—কৌলীন্যের সেই পুণ্য রাজগৃহ এখন "বল্লাল ঢিবির স্তূপে পরিণত হইয়াছে! বিশ্বনাথের দিনে তাহার ঐতিহাসিক চিহ্ন এতটা লোপ পায় নাই। সেই গঙ্গা-খড়িয়া-সঙ্গমের অনতিদূরে অরণ্যমধ্যে পরিপাটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, বিশ্বনাথ ইদানীং বৎসরের অধিকাংশ কাল যাপন করিত।

বিশ্বনাথের অনুরোধে ভগবান এইখানে আসিয়া বাস করিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছু দিনের ঘনিষ্ঠতায় পাঁচকড়ি সর্দ্দার বুঝিতে পারিল, বৈদ্যনাথের বল শক্তি যত, সাহস এবং বুদ্ধি সেই অনুপাতে কম। বুঝিল, এত দিন যে তাহার চলিয়াছিল, সে কেবল বিশ্বনাথ তাহাকে চালাইত বলিয়া। পাঁচ-কড়ি সর্দ্দার নিজের বাড়ীর কাছে তাহার ঘর দুয়ার তৈয়ারি করিয়া দিল, যথাসম্ভব সর্ব্বদা তাহাকে কাছে কাছে রাখিত। ইহাতেও কিন্তু গোপ-

সন্তান নিঃশঙ্কচিত্ত হইতে পারিত না। বিশ্বনাথের ভয়ে রাত্রে প্রায় তাহায় নিদ্রা হইত না।

অতএব বৈদ্যনাথ দত্ত আশার ভরসায় একান্ত নির্ভর না করিয়া পাঁচকড়ি সর্দ্দার নিজের চরদের দ্বারাও খবরাখবর লইতে লাগিল। বিশ্বনাথ বা তাহার দলের কাহারও খোঁজখবর পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু অন্যান্য বৎসরের চেয়ে এবার স্বরূপগঞ্জের আড্ডায় পূজার ধূম বরঞ্চ বেশী। কৌশলী-সর্দ্দার বিশ্বনাথের চতুরতা কতক না বুঝিল এমন নহে। বৈদ্যনাথ অভয় দিয়াছিল, নবমীপূজার বলির সময় দলপতি অবশ্য ধরা পড়িবে। সর্দ্দার বুদ্ধিখরচ করিয়া স্থির করিল, বাঘ যদি ফাঁদে পড়ে, মহাষ্টমীর সন্ধিপূজাক্ষণ তাহার উপযুক্ত অবসর।

ষষ্ঠী সপ্তমী একরূপ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। পাঁচকড়ি সর্দ্দার সদলে কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে হাজিরি দিতে গিয়াছে এবং পূজার ছুটিতে তাঁর শীকারখেলায় সহায়তা করিতে যাইবে, ইহাই রাষ্ট্র। বাস্তবিকও অষ্টমীর মধ্যাহ্ণে প্রায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট্ শীকারে বাহির হইয়া গেলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহরে সন্ধিপূজা। যথাসময়ে ভাগীরথীর অপর তীরে নদীয়ায় বোম এবং বন্দুকের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হইল। তখন স্বরূপগঞ্জ হইতে বোমের উপর বোম ফুটিয়া উঠিয়া জাহ্নবী-খড়িয়ার সমঙ্গস্থল কম্পিত করিয়া তুলিল। বাদ্যভাণ্ডকোলাহলে ভাগীরথীরউভয় কূল স্পন্দিত হইতে লাগিল!

এমন সময়ে নদীতীরের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথে সহসা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যোদ্ধৃবেশী অশ্বারোহী সিপাহী দল সঙ্গে দেখা দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র সেনা বিশ্বনাথের আড্ডার চতুঃসীমা অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পাঁচকড়ি সর্দ্দার একটু পশ্চাতে ছিল, তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই।

দ্বারে দীর্ঘমূর্ত্তি বলিষ্ঠদেহ বৈষ্ণব এক জন অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষে চন্দনের অক্ষরে হরিনামের ছাপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইলিয়ট সাহেব তাহাকে দেখিয়া অশ্ববেগ সংযত করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ হায় তুম্?—বিশ্বনাথ বাবু?"

বাবাজীটি আর কেহ নহেন,—ভগবান মদক স্বয়ং। সে সাহেবকে সেলাম করিয়া আত্মপরিচয় দিবে, ঠিক এমন সময়ে পাঁচকড়ি সর্দ্দার সদলে বিস্তর লাঠি সড়কী লইয়া পৌছিল। সাহেক ভগবানের দিকে বেত্র নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে সুধাইলেন—"কেমন, এই বিশ্বনাথ বাবু?"

পাঁচকড়ি সর্দ্দার অনেক দিন বিশ্বনাথকে দেখে নাই, ভগবানকেও চিনিত না, সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। বৈদ্যনাথ ঢাল তল-ওয়ার ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, ইঙ্গিতে সর্দ্দার ভগবানের পরিচয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। ইলিয়ট সাহেব বক্রদৃষ্টিতে ইহা লক্ষ্য করিলেন। বৈদ্যনাথ করযোড়ে বলিল, "খোদাবন্দ, এ ব্যক্তি বিশে ডাকাত নয়, তবে তা'র দলের লোক বটে!"

"কি! আমাকে বলিস্ ডাকাত, ব্যাটা ভেমো গোয়াল্া? এক চড়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব জানিস্? মাজিষ্টর সাহেবের সাম্‌নে বলে খাতির করব না!" ভগবান সদর্পে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথ জানিত, ভগবানের পক্ষে ইহা সম্ভব। অতএব সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। থতমত খাইয়া বলিল, "না মোশাই তোমাকে কি আমি ডাকাত বল্‌তে পারি! হুজুর ভগবান ওনার নাম। অনেক কাল ডাকাতের দল ছেড়েছেন, বড় ভাল লোকটি!"

ভগবান হাসিল। "ধর্ম্মাবতার! আপনি হলেন দুনিয়ার মালিক। একমুখে দু'কথা শুন্‌লেন। এদের কথায় বিশ্বাস হতে পারে কি না, বিচার করুন।"

সাহেব ভ্রূকুটি করিয়া পাঁচকড়ি সর্দ্দারকে শাসাইয়া উঠিলেন, "দেখাও

আভি কাঁহা হ্যায় বিশ্বনাথ ডাকাত। নেহি ত আচ্ছা নেহী হোগা।”

পাঁচকড়ি সর্দ্দার বৈদ্যনাথকে দেখাইয়া দিল। জনাব আলি, এই গোয়েন্দার কথায় পিত্তয় করে আমি মারা যেতে বসেছি।”

বৈদ্যনাথ রোদনোন্মুখ হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ইচ্ছা— বলে যে, নবমীর দিন আসিতে বলিয়াছিল, আজ নহে; কিন্তু কথা ফুটিল না। ইলিয়ট সাহেব তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুই বেত কষাইয়া দিলেন। তারপর পূজাবাটীতে প্রবেশ করিলেন।

পূজাদর্শকের অধিকাংশ স্ত্রীলোক সেই অবসরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল! সিপাহীরা কাহাকেও যাইতে দিল না।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পূজাবাটীতে সাহেব যখন প্রবেশ করিলেন, তখন আরতি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাহিরের গোল ভিতরেও প্রবেশ করিতেছিল—পুরোহিত নূতন লোক, পূজাটা শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচেন, সকলেই চঞ্চল এবং উৎকণ্ঠিত। কেবল বাটীর অধিকারিণী স্ত্রীলোক দুটি স্থিরভাবে প্রতিমার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতেছিলেন।

সাহেবকে দেখিয়া সরলা চামর ফেলিয়া ঘোমটা টানিয়া নৈবেদ্যের ঘরে পলাইল। অপরা—মীরা—কিন্তু কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, পূর্ব্ববৎ বীজন করিতে লাগিল। একবার মাত্র ধূনাচূর্ণ লইয়া ধূপদানিতে দিল। পট্টবস্ত্রমণ্ডিতা সে গৌরীমূর্ত্তি, মহিমাময়ী অথচ লজ্জাবিনতা—ইলিয়ট সাহেব প্রশংসমান চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ইনি?” স্থির বিদ্যুতের মত কৃশাঙ্গী সরলা যে চকিতে

পলাইয়া গেল, তাহাও ইলিয়ট লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুধাইলেন—অন্য স্ত্রীলোকটিই বা কে?

ভগবান বলিল, "ইনি বিক্রম সিংহের কন্যা, পিতার মৃত্যুর পর গঙ্গাতীরে বাস করচেন। অন্যটি এঁরই বহিন; এঁরাই এখন এ বাটীর মালিক।"

সাহেব চসমার ভিতর হইতে স্থির দৃষ্টির কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তবে কে?"

হাসিয়া ভগবান উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার! আমি এঁদেরই ছেলে, নিজের হরিনাম নিয়ে থাকি।"

ইলিয়ট সাহেবের সন্দেহ হইল। এই বুড়াটা বলে কি না, সে এই যুবতীদের ছেলে; অবশ্য এর ভিতর রহস্য আছে। সাহেবের দোষ ছিল না। তখন ইংরেজে এ দেশে সবে নূতন, এদেশী রীতি নীতি জ্ঞানের বড় ধার ধারেন না। 'মাতৃবৎ পরদারেষু' যে হিন্দু সভ্যতার অস্থি মজ্জা, তখনকার কথা দূরে থাক. এখনও সাহেব-মহলে সে তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় নাই। তখনকার ইংরেজের চক্ষে নেটীভেরা কমনীয়গুণমাত্রবর্জ্জিত। প্রমাণ, মেকলের কটূক্তি।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তীক্ষ্ণ স্বরে সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিলেন, "বোলাও তোমার গোয়েন্দাকো!" বৈদ্যনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল, সাহেব মীরার দিকে বেত্র নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে সুধাইলেন যে, সে তাঁকে চেনে কি না?

ডাকাতির রাত্রের সে দেবীমূর্ত্তি বৈদ্যনাথ ভুলিতে পারে নাই। সরলাকেও বেশ মনে ছিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "চিনি, বিক্রমসিংহের বেটী।"

ইলিয়ট ভগবানকে বলিলেন, দোসরা জেনানাকোভি সনাক্ত করনে হোগা!" ভগবান করযোড়ে প্রার্থনা করিল, পূজা শেষ হইতে দেওয়া হোক!

আরতিটা দেখিতে সাহেবের মন্দ লাগিতেছিল না। কিন্তু ঢাক ঢোলের বাদ্য তাঁর কানে বড় বাজিতেছিল। তিনি বাজনদারদের দিকে বেত উঁচাইয়া হাঁকিলেন, "বস্ চুপ রও!" তার পর বিনা বাদ্যে কেবল মাত্র ঘণ্টা বাজাইয়া কম্পিতদেহ পুরোহিত ঠাকুর যথাসম্ভব সত্বর সন্ধিপূজা শেষ করিলেন।

ভগবান সাহেবকে বলিল, "হুজুর! যিনি আড়ালে আছেন, তিনি আপনার সামনে বাহির হবেন না। মর্জ্জি হয় ত আপনার অসাক্ষাতে বদে তাঁকে সনাক্ত করুক। তা হলে হুজুরকে একটু বাহিরে যেতে হয়।" সাহেব চটিয়া আগুন হইলেন। তাঁর মতে, এ অতি হাস্যকর প্রস্তাব ; প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান তবু ছাড়ে না। সে বাহিরের সকল লোককে বাহির করিয়া দিল। সাহেবের সঙ্গে রহিল কেবল পাঁচকড়ি সর্দ্দার ও বৈদ্যনাথ। সরলা এর আগে আর কখন সাহেব দেখে নাই, সাম্‌নে আসিতে বড় সঙ্কুচিতা হইল। ইচ্ছা, ঘোমটা বজায় রাখিয়া কোনও মতে এ বিপদ কাটাইয়া তোলে, কিন্তু মীরা বুঝাইয়া দিল যে; তাহা অসম্ভব। সেই মুখ খুলিয়া কথা কহিতেই হইবে, কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তার ঠিকানা কি? মাঝে হইতে অনর্থক কেবল লাঞ্ছনা। কাজেই সরলা মীরার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ বলিল, "এ মা ঠাকুরাণীকেও চিনি হুজুর, ইনি হলেন দেবীপুরের জয়দুর্গা ঠাক্‌রুণের কন্যে।"

সুযোগ দেখিয়া ভগবান কহিল, "ধর্ম্মাবতার, এ লোকটা কি করে মাঠাকুরাণীর পরিচয় জান্‌লে, সেটা ওকে জিজ্ঞাসা করা হোক্!'

ইলিয়ট সাহেব ভ্রু কুঞ্চিত করিলেন। সন্দেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "এ লোকটা তবে কি মিছা বল্‌চে?"

ভগবান বলিল, "তা বল্‌চি নে হুজুর। কিন্তু সে কথাটা সাফ হলেও লোকটার হাট হদ্দ সকলই হুজুরের মালুম হবে।"

তখন ভগবান বৈদ্যনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, নেমকহারামির যা ফল, তা সে হাতে হাতে পাইয়াছে। এখন মিছা কহিয়া আর যেন পাপের ভার বৃদ্ধি না করে। সম্মুখে ঐ গঙ্গা, মাথার উপরে ঐ মা দুর্গা, কোন কথা, লুকাইলে তার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

বৈদ্যনাথ যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে গল্প করিল। ইলিয়ট সাহেব তাহার ফলে সরলার প্রতি কিছু দয়ার্দ্র হইলেন। সুধাইলেন, বিশ্বনাথ বাবু তাঁর কে হন?"

সরলা এ পর্য্যন্ত কোনও কথা কহেন নাই, কহিবার প্রয়োজনও হয় নাই। মুখ নত করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "তিনি আমায় মা বলেন। আমার ধর্ম্মছেলে।"

সাহেব হাসিয়া উঠিলেন, "কি আপদ! তোমার মত বালিকা কি করে কারও মা হতে পারে?"

সরলা উত্তর দিতে পারিল না! মীরা কহিল, "সাহেব! সোয়ামি ছাড়া সব্বাইকে আমরা সন্তান মনে করি। তার ছেলে বুড়ো নেই।"

পাঁচকড়ি সর্দ্দার করযোড়ে প্রার্থনা করিল, ধর্ম্মাবতারের যদি অনুমতি হয়, বিশের সম্বন্ধে গোটাকতক কথা সে মাঠাকুরাণীদের সুধাইবে। তার বিশ্বাস, সব কথা তাঁরা জানেন।

ভগবান পাঁচকড়ি সর্দ্দারের প্রতি রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কহিল যে, বৈদ্যনাথের নিজের কথাতেই প্রমাণ যে সে ডাকাত। পাঁচকড়িকে মাঠাকুরাণীরা কখন চেনেন না; সে কেমন

লোক, বলা যায় না। মাঠাকুরাণীরা বাজে লোকের সঙ্গে কথা কন না, জিজ্ঞাসা যত যা করিতে হয়, হুজুর নিজেই করুন।

ইলিয়ট আর কখন এদেশীয় কুলমহিলাদের সম্মুখীন হন নাই, ভগবানের আপত্তি সঙ্গত মনে করিলেন, এবং একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কতক হিন্দী কতক বাঙ্গালায় উভয়কে প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা বিশ্বনাথ বাবুর কোনও খবর বলিতে পারেন?"

মীরা বলিল, "সাহেব, যিনি কখন উপকার করেন, প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রত্যুপকার করতে হয়। এ ক্ষেত্রে জান্‌লেও আমরা এমন কোন কথা বল্‌তে পারতাম না, যাতে বিশ্বনাথের অনিষ্ট হতে পারে; কিন্তু বাস্তবিকই আমরা এখন তাঁর কোন খবর জানিনে।"

সরলার আয়ত চক্ষু এই উত্তরে হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার অর্থ, এ কথাটা অমন গুছাইয়া সে সাহেবকে কখনই বলিতে পারিত না। ইলিয়ট সাহেবও ইহাতে প্রীত হইলেন। মহিলাদ্বয় যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত, তাহাতে তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না। তাঁহাদের কোন কথায় অবিশ্বাসের স্থল ছিল না। সাহেব সসম্ভ্রমে বিদায় হইলেন। উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়া গেলেন, "যদি কখন বিপদে পড়েন, আমায় স্মরণ করিবেন।"

বাহিরে আসিয়া ভগবান জানাইল যে, মাঠাকুরাণীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতে চাহেন না। সাহেব আপ্যায়িত হইয়া ধন্যবাদ দিলেন এবং আহ্লাদসহকারে কদলী ও বাতাবি লেবুর উপহার গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার আদেশে বৈদ্যনাথের হাতে তখনই হাতকড়ি পড়িল। পাঁচকড়ি সর্দ্দার মর্ম্মে মরিয়া গেল। তাহারও অপমানের কিছু বাকি ছিল না।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী পূজার পর নৌকারোহণে নবদ্বীপের দিকে চলিয়াছেন। সচরাচর তাঁহার চরণযুগল ছাড়া অন্য যানের তিনি বড় তোয়াক্কা রাখেন না। কিন্তু এবারে একটু কথা ছিল,—দস্যুপতি বিশ্বনাথের হাতে আবার পড়িতে তাঁর বিশেষ আপত্তি। এখন আর ভয় ছিল না—কিন্তু লজ্জা রাখিবার ঠাঁই ছিল না। সরলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার অব্যবহিত পরেই বিশ্বনাথের সেই ব্যঙ্গমিশ্রিত তিরস্কার ভগবৎপ্রেরিত দণ্ডতুল্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাড়ে হাড়ে বাজিয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জায় পড়িয়া তিনি সরলার আর কোন খোঁজ খবর করিতে পারেন নাই। সে ঘটনার পর আর বাটীর বাহির হন নাই। পাশা-খেলায় বিনোদের বড় আসক্তি—সন্ধ্যার পর বসিয়া দেড় প্রহর না খেলিলে তাঁহারা চলিত না। কিন্তু গৃহে বিশ্বনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি সে আমোদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর কোথাও যাইতেন না।

জগদ্ধাত্রীপূজার কিছু দিন আগে বিনোদবিহারী এক লোভে পড়িয়া গৃহকোটর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। নিমন্ত্রণ চিঠি পাইয়াছেন, সমুদ্রগড় অঞ্চলে এক ধনশালিনী অনূঢ়া কুলীনকন্যার কুল রক্ষা করিতে হইবে। বাটী হইতে সমুদ্রগড় পদব্রজে দেড় দিনের পথ, কিন্তু পথে প্রায় সর্ব্বত্র বিশ্বনাথের আড্ডা। কাল্নার ডাকাতির পর বিশ্বনাথ গা-ঢাকা দিয়াছে, দেশময় সে খবর রাষ্ট্র হইয়াছিল। নিশ্চিন্ত মনে বিনোদ শান্তিপুরে আসিয়া নৌকায় চড়িলেন।

সন্ধ্যার একটু আগে নৌকা মৃজাপুরের খালের কাছাকাছি, সমুদ্রগড় অদূরে। এমন সময়ে খালের ভিতর হইতে এক খানা দীর্ঘ পান্সী বেগে আসিয়া গঙ্গাবক্ষে পড়িল। তাহার দাঁড়ি মাঝিদের উল্লাস কোলাহলে,

তালে তালে দাঁড়পতনের ধারাবাহিক শব্দে, একটা সুদৃঢ় সংকল্পের ভাব সূচিত করিতেছিল। "গঙ্গা মায়ী কি জয়! কালী মায়ী কি জয়!" শুনিয়া বিনোদ বুঝিলেন, ডাকাতের দল তাঁহার সম্মুখে।

কিন্তু সে পান্সী আপন মনে বাহিয়া চলিল, বিনোদকে কিছু বলিল না। বিনোদের নৌকাও উজানে পাইল পাইয়া চলিতেছিল। সন্ধ্যা-তিমির ঘনাইয়া আসিল। সমুদ্রগড়ের ঘাট দেখা যাইতেছিল সহসা সেই পান্সীর দাঁড়পতনশব্দ, ঘুরিয়া স্রোতোমুখে ঘনতর হইয়া আসিল। মাঝি উদ্বিগ্ন হইয়া বিনোদকে জানাইল, সমুদ্রগড়ের ঘাটে পৌছিবার আগে পান্সী নৌকার উপর আসিয়া পড়িবে।

হইলও তাই। দস্যুহস্তে বন্দী হইয়া বিনোদ পান্সীতে নীত হইলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি পর্য্যন্ত তাহারা উঠাইয়া লইল, কিন্তু মাঝি মাল্লাদের কিছু বলিল না। অধিকাংশ দস্যু সমুদ্রগড়ের কাছে নামিয়া গেল। অন্ধকারে, তায় রুদ্ধচক্ষে বিনোদ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কি উদ্দেশে ডাকাতেরা তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া দিল, সকলের উপর তাহাই ভাবিয়া তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইতেছিলেন।

পান্সী যখন তীরলগ্ন হইল, তখন রাত্রি প্রায় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। শৃগালেরা সহসা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সর্ব্বত্র শান্ত নীরবতা, জাহ্নবীস্রোতের কুলু কুলু রবও সেই শান্তির সঙ্গীতমাত্র। অন্ধকারে রুদ্ধনয়নে বিনোদ বুঝিলেন, ডাকাতেরা তাঁহাকে পাল্‌কীতে পুরিল। বিনোদ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। প্রাণের ভয় বা ভরসা কিছুই তাঁহার ছিল না।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

লজ্জিত অপমানিত পাঁচকড়ি সর্দ্দার মনে মনে শপথ করিল, বিশে ডাকাতের আড্ডা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় না হইয়া সে আর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মুখ দেখাইবে না। এ দিকে বৈদ্যনাথ বিশেকে ধরাইয়া দিতে পারিল না বটে, কিন্তু অনিষ্ট যা করিবার, সেই করিয়া গিয়াছিল। তাহার কাছে সর্দ্দার বিশ্বনাথের নাড়ীনক্ষত্র সকলই জানিয়া লইয়াছিল। স্বরূপগঞ্জের কাণ্ডের পর বাড়ী না গিয়া সে শান্তিপুরের দিকে গেল। ইচ্ছা, সেখানকার বিখ্যাত উপরগস্তিদের (১) দলে মিশিয়া বিশে ডাকাতকে ধরিবে, পারৎপক্ষে আর সাহেবদের শরণাপন্ন হইবে না।

এ দিকে স্বরূপগঞ্জে পাঁচকড়ি সর্দ্দার এবং বৈদ্যনাথের নাকালের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীতলার শিবিরে মহাষ্টমীনিশায় ভারি উল্লাস পড়িয়া গিয়াছিল। দলের লোকদের উৎসাহে বিশ্বনাথ সে আমোদে যোগ দিয়াছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে নহে। নেতৃত্বে যতগুলি অসামান্য গুণের দরকার হয়, দূরদর্শন তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বিশ্বনাথের তাহা যথেষ্ট ছিল। স্বরূপগঞ্জের ঘটনায় সে বুঝিয়াছিল, কারারুদ্ধ বৈদ্যনাথ অতঃপর তাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান সাক্ষী দাঁড়াইবে, এবং চিরশত্রু পাঁচকড়ি "মরিয়া" হইয়া পিছু লাগিয়াই রহিবে। নবমীর নিশীথে সংবাদ আসিল, সর্দ্দার উপরগস্তিদলে মিশিয়া শান্তিপুরে বসিয়া আছে। বিশ্বনাথ বুঝিল, এতদিনে বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল!

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণীর নিবিড় জঙ্গলে

---

(১) পুরাতন পাঠান জায়গীরদারদের বংশধর। নিবাস শান্তিপুরের দুই ক্রোশ পশ্চিম গঙ্গাতীরবর্ত্তী হরিনদী নামে গ্রাম। গঙ্গার পশ্চিম তীরে অনেক দূর ব্যাপিয়া ইহারা বাস করিত, এবং বলবিক্রমের জন্য সেকালে দেশবিখ্যাত ছিল।

যেখানে প্রশস্ত পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডের উপর বিশ্বনাথ বাবুর দরবার বসিয়াছে, সেখানে এক বার যাই। প্রকাণ্ড শাল্মলী গাছের নীচে তৃণমণ্ডিত চণ্ডীমণ্ডপতলে একটিমাত্র মৃণ্ময় দীপ জ্বলিতেছে। তার চেয়ে গাঢ়ান্ধকার ভাল। তাহাতে গত কয় রাত্রির আনন্দোৎসবময় স্মৃতি একটা অনির্ব্বচনীয় কারুণ্যবিজড়িত বিষাদে পরিণত হইতেছে! অদূরে উৎসব উপলক্ষে রচিত তৃণপত্রাবৃত দীর্ঘ গৃহশ্রেণী চন্দ্রলোকে ক্ষুদ্র গিরিপ্রাচীরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। গৃহসংলগ্ন প্রান্তরে প্রায় পাঁচ শত মনুষ্যমূর্ত্তি বিশৃঙ্খল ভাবে বসিয়া গিয়াছে। অনেকেরই হাতে তরবারি, জ্যোৎস্নালোকে তাহার ফলক জ্বলিতেছে।

এই সমবেত ধৃতাস্ত্রমণ্ডলীমধ্যে দুইটি পরিচিত মূর্ত্তি উপস্থিত ছিল না। —বিশ্বনাথ এবং মেঘা। প্রতিমাবিসর্জ্জনের পর বিশ্বনাথ মাতাকে প্রণাম করিবার জন্য গৃহে গিয়াছে। মেঘা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। পাঁচকড়ি সর্দ্দার শান্তিপুরে গিয়া উপরগস্তিদের দলে মিলিত হওয়ার সংবাদ দলের মধ্যে কেবল মেঘা জানিত। অতএব নবমীর নিশা প্রভাত হইতে না হইতে সে বিশ্বনাথকে অনুরোধ করিল, ডুলি পাঠাইয়া মাতাকে আনাইয়া লওয়া হউক। নহিলে কি জানি শত্রুরা যদি গাড়রাভাতছালার (১) সুযোগ বুঝিয়া আজ্ "ওৎ" করিয়া থাকে। হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল, "মেঘু, চিরকাল কেবল ডাকাতিই কর্লি, মানুষ কখন চিন্‌লিনে! শান্তিপুরের যণ্ডারা আজ্ বাইচ্ খেলা ছেড়ে কোথাও নড়্বে না, সে ভাবনা করিস্‌নে। তাতে আজ ঘাটে ঘাটে ডুরে-পরা যত রঙ্গিণী এসে জুটবে। তুই নিশ্চিন্ত থাক্!"

মেঘা তথাপি সশস্ত্র হইয়া বিশ্বনাথের সঙ্গে গেল। যদিই কোন বিপদ্

(১) বিশ্বনাথের জন্মভূমি। এই গ্রাম নদীয়া জেলার চাপ্‌ড়া থানার চারি ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে।

ঘটে। বিশ্বনাথের অজ্ঞাতসারে সে নিজের দলের বাছা বাছা সড়কী-ওয়ালাদের পথের স্থানে স্থানে লুকাইয়া রাখিল।

সর্দ্দারের ফিরিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া, উন্মুখ ডাকাতেরা কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সকলকেই আজ বাড়ী ফিরিয়া আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে হইবে। কিন্তু হুকুম ব্যতীত যাইবার যো নাই। বাত্যান্দোলিত মধুক্রমবৎ সেই পাঁচ শত ডাকাতের কথায় ব্রাহ্মণীতলার বন শব্দিত হইতেছিল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গাড়রাভাতছালা গ্রামে এক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণের বাস। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথের অর্থানুকূল্যে দুর্গোৎসব করিতেন। বিশ্বনাথের বৃদ্ধমাতা এই পূজাতেই সন্তুষ্ট ছিল, নিজে কখন "ঠাকুর আনিতে" সাহস করিত না। অনুরুদ্ধ হইলে বলিত, "বাপ্‌রে, ছোট লোক বাগ্দী আমরা,—ও সব কি আমাদের সয়!" এ দিকে যে বিশ্বনাথ স্বরূপগঞ্জে মহা ধূমধামে দুর্গোৎসব করিত, সে কথা কেহ বলিলে বুড়ী বলিত, "সে ত আর বিশুর ভিটায় নয়। গঙ্গাতীরে কোন দোষ নেই!" যাহা হউক, মাতৃভক্ত বিশ্বনাথ পূজার সময় প্রায় প্রত্যহ একবার বাড়ী আসিয়া বৃদ্ধা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। মার আর কেহ ছিল না, একটি মেয়ে, আর এই ছেলেটি। এবারে কিন্তু বিশু প্রয়োজন ছলনা করিয়া পূজার ভিতর এক দিনও বাড়ী আসে নাই। কোম্পানি বাহাদুর যে বিশ্বনাথকে ধরিবার জন্য হুলিয়া করিয়াছেন, দেশের সর্ব্বত্র তাহা রাষ্ট্র হইয়াছিল। বুড়ীও তাহা শুনিয়াছিল। বৃদ্ধা জানিত, বিশু যেখানে থাক্, বিজয়ার ভ'সানের পর সে তাকে প্রণাম করিতে আসিবেই। এ দিকে মেঘার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া বিশ্বনাথ জনসমাগমমাত্রশূন্য অপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল, তাহাতে বিলম্ব ঘটিল।

আশায় পথ চাহিয়া চাহিয়া বুড়ী ক্রমে হতাশ হইল, এবং কোন অজ্ঞাত ঘোর বিপদ নিশ্চয় করিয়া সকন্যা ভাবিতে বসিল। দু জনেরই ভারি কান্না পাইতেছিল, কিন্তু বৎসরকার দিন আজ, কাঁদিলে বিশুর অকল্যাণ হবে!

মাতা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর যখন এই অবস্থা, বিশু তখন সহসা আসিয়া দেখা দিল। বুড়ী পুত্রের কল্যাণকামনায় তাহার অনুপস্থিতে অশ্রুপ্রবাহ রোধ করিয়াছিল, সাক্ষাতে সে সংযম রক্ষা করিতে পারিল না। বিশ্বনাথ মার পায়ের কাছে বসিয়া পদধূলি লইল, এবং হাসিয়া নিজ উত্তরীয়ে মাতার চোকের জল মুছাইয়া দিল। মা হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া বলিল।

"তা হাঁ বাবা, এত নোকের দুক্কু বুঝিস, মায়ের দুক্কু বুঝিস্‌নে ক্যান বাপ? আমার যে আর কেউ নেই বিশু! এমন পূজো গেল, এক দিন তুই দেখা দিলিনে। একদিন তোকে হাতে করে মা দুগ্‌গার পেসাদ খাওয়াতে পারলাম না। নোকে বলে বিশুকে কোম্পানি ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

বিশুকে দেখিয়া দিদি বেশী করিয়া সিদ্ধি বাঁটিতে গিয়াছিল—মাতার কথা শেষ হইতে না হইতে সে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধির বাটী আনিয়া ভাইয়ের সুমুখে রাখিল। বিশু দিদিকেও প্রণাম করিল, এবং তার পদধূলি মাথায় মাখিয়া বলিল,

"মা না হয় বুড়োমানুষ, একটুতে ভয়ে কেঁদে সারা হয়! তোর মুখটো অমন শুকনো শুকনো কেন দিদি? তুইও কেঁদেছিস্‌ বুজি? তোরা ভাবিস্‌ কি যে বিশে একটা পাখ পাখালি, অমনি ধরলেই হলো!—নয়?"

দিদি বলিল, "বিশু, কেনই বা তুই ও ছাই ব্যবসা করিস্‌? বাপ পিতেমহ চাষবাস করে যা করেছিল, ডাকাতি করে তার চেয়ে বেশী তুই কি কর্‌লি ভাই! কেবল পরের পেট ভরাচ্চিস্‌, আর নাম কিন্‌চিস্‌! নক্ষী ভাই আমার, ও সব ছাড়্‌, মা তোকে আর বেরুতে দেবে না।"

বিশ্বনাথ হাসিয়া দিদিকে কহিল, "তুই বুঝি, মাকে এই সব কু পরা-

মোশ দিয়েছিস্ ? তাই বলি, মা এমন করে ত কখন কাঁদে না, আজ কেন বছরকার দিনে কাঁদবে ! তা আর দেরি করিস্‌নে। এক ঘটী জল আন্। খেয়ে পালাই।”

মা বলিল, “হাঁ, যাবি বই কি ? আজ রাত্তিরে কোথাও যেতে পাবিনে।”

বিশ্বনাথ ইহা শুনিয়াও শুনিল না। কথাটা চাপা দেওয়ার ভরসায় সে বলিল, “মা ! কাপড় সব বিলি করে দিইচিস্ ? ঐ ত্যাখ্ ! আর এক পুটুলি এনেচি। যদি কাউকে দেওয়া বাকী থাকে, দিস্ !”

বুড়ী হাসিয়া বলিল, “ও সব ভোগা রেখে দে ! তুই আমার পেটে হয়েচিস্, কি আমি তোর পেটে হয়েচি ! আর তোর কোথাও যাওয়া হবে না। যদি যাস্, আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব,—ঠিক বল্‌চি বিশু !”

বিশু মাতার পৃষ্ঠে আদরের হাত বুলাইয়া ক্ষীণ হাসি হাসিল। “মা, কোম্পানি যে রকম বাদে লেগেচে, তোমার কোলে থাক্‌তেও ভয় হয় ! এই বিপদ কেটে গেলে, তুমি যা বলবে, তাই করব। আজ বিদায় দাও।”

বুড়ী বিশুর হাত ধরিল। আবার সেই লোল গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারার উপর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল ! বলিল, “বিশু, ছেলেবেলায় কোম্পানির সিপাইদের নাম শুনে কত ভয় করতিস্ ; যে শোলোক বলে নাচ্‌তিস্, তা কি তোর এখন মনে পড়ে না—

কি হলোরে জান।
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তি গায়
হাঁটু গেড়ে মারচে তীর মীরমদনের গায়॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে
একেলা মীরমদন সাহেব কত নেবে সয়ে॥

মীরমদন পীর ছিল, কোম্পানির সঙ্গে নড়তে গিয়ে সে মরে গেল। অমন নবাব সেরাজউদ্দৌলা, তার রাজ্যি ছার খার গেল। দুঃখিনী বাগ্দীর ছেলে তুই, কি ভরসায় তুই কোম্পানির সঙ্গে যুঝ্‌তে চাস্? দিদি তো ঠিকই বলেচে, এ ছাই ব্যবসা ছাড়!"

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। মা বলিয়া চলিল,

"কত বার বলেচি বাবা, এ ছাই ব্যবসা ছাড়। এত দিন শুনিস্‌নি, এখন শোন্। এত টাকা যে আন্‌লি, ঘরে কি রাখ্‌তে পেরেছিস্ বাপ্? পাপের টাকা থাকে না। নিজের সুখ বাড়াতে পেরেচিস্? তোর দৌলতে কত পূজো স্বস্তেন্ করলাম, কত বামুনের বিয়ে পৈতা দেলাম, তাতে কি হলো বল্? বউমাটি পর্য্যন্ত ছেলে বিয়তে গিয়ে মারা গেল! আহা অমন নক্ষী বউ কি আর হয়! ডাকাতি এমনি পাপ! ও পাপ ছেড়ে বাপ আমার চাষবাস কর, আবার বিয়ে কর্; ছোট মেয়ে যদি বিয়ে না কর্ত্তে চাস্, ইট্‌লের * সেই মেয়েটিকে এনে সাঙ্গা কর। আমাদের তেঁতুল বাগ্দীর ভেতর ত সে চলন আছে।"

বিশ্বনাথ হাসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "মা! তোমার কথা এই-বার সত্যি সত্যি শুনব। আর একদিন মাত্তর একটা জায়গায় ডাকাতি করব। অনেকগুলো টাকা পাব। তার ওর সত্যি সত্যি এ ছাই ব্যবসা ছেড়ে দেব। দলের নোকগুলকে আজই বিদায় দেব। কিন্তু মা, মা কালী বুঝি আর তোমার বিশুকে রক্ষে করেন না।"

শেষের কথা কয়টি বিশু অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিল, মাতাকে শুনাইবার জন্য নহে। কিন্তু বুড়ী শুনিয়া "ষাট্, ষাট্!" করিয়া উঠিল।—"ষাট্, ষাট্ বাপ আমার, অমন কথা মুখে আনিস্‌নে বিশু!" চক্ষু মুছিয়া বুড়ী দাঁড়া-

* বিশ্বনাথের রক্ষিতা: ইট্‌লে গ্রাম দিগ্‌নগরের উত্তরে।

ইয়া উঠিল।—"মা কালী আমার বাস্তু দেবতা! ডর কি বাপ? আমি মানত করচি, রক্ষাকালীর পূজো দেব!"

তখন মাতার চরণধূলি মাথায় মাখিয়া বেগে বিশ্বনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। গ্রামের কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিল না। একেবারে গ্রামেরবাহিরে উপস্থিত হইল। সেখানে দীঘির ঘাটের উপর বটগাছের ছায়ায় লুকাইয়া মেঘা সোৎসুকে অপেক্ষা করিতেছিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রণপায় উঠিয়া দুই জনে পাশাপাশি চলিল। জনশূন্য, সচরাচব বৃক্ষ গুল্মাদিশূন্য, সীমাপরিশূন্য, প্রান্তরের পর প্রান্তর উভয়ে দ্রুতগতি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শারদ কৌমুদী সর্ব্বত্র রজত সুষুপ্তি বিস্তার করিতেছে। মাতা প্রকৃতি সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও বঙ্গের সুখোৎসব-অবসান দিনে স্নিগ্ধ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। গ্রামসন্নিহিত যে সব শ্যামল প্রান্তর কালিকার নিশীথে উৎসববাদ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, আজ তাহারা নীরবে তারকাসনাথ সুনীল আকাশের বিরাট মূর্ত্তির পানে বিস্ময়ে চাহিয়া আছে সকলই শান্ত সমাহিত—কেবল ঝিল্লী রব আপন মনে শব্দিত হইতেছে। ভাব-চক্ষে বিজয়াদশমীর জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী বাস্তবিক বড় অবসাদময়ী। বিসর্জ্জনের যে করুণ ভৈরবী প্রভাতে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সন্ধ্যায় পূরবীর বিদায়গানে তাহার অশ্রুনীর সঞ্চিত করিয়াছে! নিশাসমাগমে, বিষণ্ণ প্রকৃতির মুখে তাহাই আবার বেহাগ রাগের উদাস গাম্ভীর্য্য প্রকটিত করিতেছে।

বিশ্বনাথ কি ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিল, ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু তাহার মনটা ভাল ছিল না। বিশু নিজে হইতে কোন কথা বলে

না দেখিয়া মেঘা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "বিশু, এমন লুকিয়ে লুকিয়ে আর ক' দিন চলবে বল? এত দিন আমি তত ডরাই নেই, কিন্তু এখন আর ভরসা হচ্চে না।"

বিশ্বনাথ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ,—জানিস্ তো?"

মেঘা চুপ করিয়া রহিল। বিশ্বনাথ বুঝিল, কথাটা মেঘার ভাল লাগে নাই। বলিল, "তুই কি কর্‌তে বলিস্?"

মেঘা। আমি বলি কি বিশু, আজকে তুমি দরবারে সব কথা খুলে বল। বড় বড় দল পুষে এখন কেবল বেহাত হওয়া। বেশীর ভাগ লোককে বিদায় দিয়ে কেবল কেবল বাছা বাছা কালীর পাক্ জন কয়েককে সঙ্গে রাখ।

বিশ্বনাথ একটু ভাবিয়া বলিল, "মেঘু, তোর কথাই ঠিক্, কিন্তু আমি বলি কি একটু আশা ভরসা না থাকলে এই দুর্দ্দিনে দলের লোকগুলো শত্রু হয়ে উঠতে কতক্ষণ? স্পষ্ট করে সব কথা খুলে বল্‌লে দলের বেশীর ভাগ লোকের চোকে আমার মানসম্ভ্রম কিছুই আর থাকবে না, মেঘু। তা আমি করচিনে। সাহসই লক্ষ্মী। আজ আমি সবাইকে মিষ্টি কথায় বিদায় দেব। ফেডি * সাহেবের কুঠী লুঠ করি আগে। তার পর তোর পরামর্শ মত চলাই ঠিক।"

মেঘা বলিল, "কিন্তু ফেডি সাহেবের কুঠী লুঠ করা কি বড় সহজ ভাবচ বিশু? মাজিষ্টার সাহেবের কুঠীর অত কাছে! তা ছাড়া, কথার বলে গ্যাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। দাদনের টাকা এখনও এসে পৌছায় নি?"

বিশ্ব। নীট্ খবর না পেয়ে কি কোন কাজে, আমি কখন যাই?

---

* Samuel Fady:

টাকার জন্যে জরুরি তাগিদ ক' দিন হলো কল্‌কাত্তায় রওনা হয়ে গেছে। এলো বলে টাকা! অমাবস্যার ভেতর সাফ করতে হবে।

আর কোন কথা হইল না। রাত্রি পাঁচ দণ্ডের ভিতর উভয়ে ব্রাহ্মণী-তলায় ফিরিয়া আসিল।

সেই সমবেত উন্মুখ দস্যুসেনায় সঙ্গে সে রাত্রে দলপতির কি কথা-বার্ত্তা হইল, তাহার সবিশেষ পরিচয় স্থল এ নহে! বিশ্বনাথ সকলের সঙ্গেই কোলাকুলি করিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিল। প্রত্যেককে অনুরোধ করিল, দেওয়ালীর দিন রাত্রে যেন কৃষ্ণনগরের নীল বনে লুকাইয়া থাকে।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মাঝখানে গোটাকতক কথা ছাড়িয়া গিয়াছি। এইবার সে ত্রুটী সংশোধন করিব।

প্রত্যাখ্যাতা সরলা নৌকায় আসিয়া উঠিলে, একটু পরে বদন আসিয়া জুটিল! নিজের অপহৃত সেই পেটারিটি তাহার হাতে দেখিয়া সরলা অতিশয় বিস্মিত হইল! বদনের কাছে শুনিল, এইমাত্র স্বয়ং বিশ্বনাথ দিয়া গিয়াছে। মনের তখনকার অবস্থায় সেই উত্তরেই সরলা নীরব হইল—তখন আর কিছু সুধাইল না। বদন দিদির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে আর কেন? নৌকা বাড়ী ফিরে চলুক!" সরলা বলিল, "না ভাই, বাড়ীতে আর এ মুখ দেখাব না। তুই আমায় গঙ্গার পথে নবদ্বীপে নিয়ে চল্!"

ও দিকে কাল্‌নার সেই ব্যাপারের পর ভগবান মেয়েটিকে তাহার মামার বাড়ী রাখিয়া আসিল। বিশ্বনাথ বুঝিয়াছিল, বৈদ্যনাথ যখন

গোয়েন্দা দাঁড়াইয়াছে, আড্ডাগুলিতে তাহার নিজের বসবাস আর কর্ত্তব্য নহে। স্বরূপগঞ্জের আড্ডার উপর যে শত্রুদের সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি পড়িবে, তাহাও দলপতি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল! সরলার নৌকা ঘুরিয়া স্রোতো-মুখে গিয়াছে, সে খবর পাইতে তাহার দেরিমাত্র হইল না! ভগবানকে অনুরোধ করিল, মাঠাকুরাণীকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া যেন স্বরূপগঞ্জের বাটীতে বাস করিতে প্রবৃত্ত করে। ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া নিজে বিশ্বনাথ বিক্রম সিংহের গৃহে গেল। মীরাকে সরলার সকল সংবাদ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি সেই দুঃখের দিনে অনাথা বালিকার কোন উপকার করিতে পারেন কি না। মীরা তখনও নিজে শোকাচ্ছন্ন। চক্ষু মুছিয়া বলিল, "যাঁর বলে উপকার কিছু করলে করতে পারতাম, তিনি ত আর নেই! আমি কি করতে পারি?" পীতাম্বর বলিল, "দিদি, বিশ্বনাথ আমাদের বড় ভেয়ের মত। বাবার মৃত্যুকালে তিনি যে উপকার করেচেন, আমাদের বংশে কেউ কখন তা ভুল্‌বে না। তুমি শোকে অধীর হয়েচ। বাড়ীতে থেকে সামনে উঠতে পার, বোধ হয় না। তুমি কেন দিন কতক সরলাকে নিয়ে গঙ্গাতীরে বাস কর না!" বিশ্বনাথ ইহাই চায়, বালিকা সরলার কাছে এক জন অভিভাবিকা স্ত্রীলোক থাকার একান্ত প্রয়োজন সে অনুভব করিতেছিল। প্রকাশ্যে পীতাম্বরের কথার সমর্থন করিয়া বলিল, "এতে দিদিঠাকরুণের মনও ভাল হবে, সে অনাথা মেয়েটিরও উপকার হবে!" অতএব কিছুদিনের মধ্যে পীতাম্বর নিজে দিদিকে স্বরূপগঞ্জে রাখিয়া গেল।

সেখানে দুই চারি দিন বাস করিয়া মীরার অভিলাষ হইল, পিতার দাহস্থলে একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া দিবে। পীতাম্বরের সঙ্গে যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিল, একটি শিবমন্দির এবং সচরাচর গঙ্গাবাসের জন্য একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিবে। স্বরূপগঞ্জের প্রাকৃতিক দৃশ্য পীতাম্বরের এরূপ ভাল লাগিয়াছিল যে, অবিলম্বে এই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার

আয়োজন করা হইল। ইলিয়ট্ সাহেব যখন শিকার খেলিতে আসেন, বাসের জন্য মাটির ঘর সব তখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। শিবমন্দিরের মালমসলা সংগৃহীত হইয়াছিল। পূজার পর সুরু হওয়ার কথা।

বিশ্বনাথের কৌশল এবং দূরদৃষ্টি কতকটা সফল হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পূজার পর কার্ত্তিক মাসে গ্রামে গ্রামে উষাসংকীর্ত্তন সুরু হইয়াছে। ঘনবরষার অবসানে কুমুদকহ্লারভূষিতা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি শারদ কৌমুদীতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রকৃতি মাতৃরূপা, তাহাই শরতে মা ব্রহ্মময়ীর উৎসব। তার পর সেই মাতৃভক্তি ধীরে ধীরে স্নেহ প্রেমে পরিণত হইতেছে। বঙ্গসন্তান বিশ্বকারণের শরতসুন্দরী মাতৃমূর্ত্তি সসম্ভ্রমে দূরে রাখিয়া, ভক্তির আপেক্ষিক ভেদজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া, আবার তাঁহাকে আবাহন করিতেছে—এস বৎস, এস সখে, এস হে প্রাণবল্লভ! এই যে বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কালে পল্লীতে পল্লীতে প্রভাতবায়ু সংকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে বাৎসল্য, সখ্য মধুররসে সুধাসিক্ত হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গসন্তানের মানসিক ইতিহাসে যথার্থ ই কি ইহা অর্থহীন?

ইহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, কার্ত্তিকমাস প্রধানত যে বৈষ্ণব-উৎসবময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান মদক সে জন্য সম্প্রতি কিছু বেশী মাত্রায় ব্যস্ত। প্রত্যূষে উঠিয়া খঞ্জনী হস্তে গ্রামে গ্রামে উষার-সংকীর্ত্তন তাহার প্রধান কাজ হইয়াছে।

বাগ্দেবীর খালের ধারে হোড়ঙ্গের নিবিড় বনের ভিতর, যেথায় বিশ্বনাথের আড্ডা, সহসা একদিন প্রভাতে সেথায় ভগবানের মধুরকণ্ঠ শুনা গেল। বালসূর্য্যের হেমাভ কিরণরাশি বহির্দ্বারসমীপস্থ প্রকাণ্ড বকুল-

গাছের ঘনপল্লবে সবে মাত্র আসিয়া পড়িয়াছে, অঙ্গনের কুসুমবর্ষী শেফালিকা তরু এখনও মূলদেশে বিন্যস্ত শিশিরসিক্ত ফুলশয্যার উপর অতি সন্তর্পণে কখন একটি ফুল ফেলিতেছে। গৃহপশ্চাতে প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষশাখায় শাখামৃগের দল ভোজনে বসিয়া গিয়াছে—তাহাদের পূর্ণোদয় শাবকগুলি শাখা হইতে শাখান্তরে লাফাইয়া পড়িতেছে। কচিৎ হরিয়াল ঘুঘুর দল লঘুপক্ষ শব্দিত করিয়া অশ্বথ গাছ হইতে বট গাছের ঘনপত্রমধ্যে আত্মগোপন করিতেছে। বিশ্বনাথের সেই অরণ্যদুর্গ সহসা জনসমাগম-শূন্য বলিয়া মনে হইতেছিল। বাস্তবিকও তথায় সম্প্রতি এক ব্রাহ্মণসন্তান ছাড়া আর কেহ ছিল না।

বিনোদবিহারী বন্দীভাবে এই নির্জ্জন গৃহে বাস করিতেছিলেন। গৃহের সর্ব্বত্র তাঁহার অবারিত গতি, কিন্তু তাহার বাহিরে এক পদও যাইবার অনুমতি ছিল না। প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া বিনোদ গায়ত্রী জপিতে বসিয়া গিয়াছেন। বিপদের দিনে তন্ময় হইয়া বিপত্তিহারী শ্রীমধুসূদনের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতেছিলেন! আগে আর কখন জীবনে এমন একাগ্রচিত্ততা সংগ্রহ করিয়া ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে জানিতেন না। ভগবান গাহিতেছিল—

সুখের দিনে তোমারে ডাকি
পরাণ মন ভরে না।
দুখের দিনে আপনা ভুলে
করি তোমারে কামনা।
এ কি ভূমানন্দ, এ কি অপরূপ,
দুঃখে হরি এ কি ছলনা।
দুখ পেয়ে যদি এই পরিণাম
সুখে কেন আর বাসনা?

উৎকর্ণ হইয়া বিনোদ কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। তখনকার মনের

অবস্থার সেই সুরময়ী আত্ম-কথা দৈববাণীবৎ ধ্বনিত হইতেছিল। এমন মোহ জীবনে তিনি আর কখন অনুভব করেন নাই। আপনা ভুলিয়া স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া, বিনোদবিহারী গায়কের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

ততক্ষণে ভগবান দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; চেনা মুখ দেখিয়া বিনোদ অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, কিন্তু গায়ককে সহসা চিনিতে পারিলেন না। ভগবান তাহা বুঝিল। গান সমাপ্ত করিয়া উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। হাসিয়া বলিল, "দেবতার এই আশ্রম? বেশ নিরিবিলি জায়গাটি, হরিনাম করার জায়গা বটে! ঠাকুর! আমায় চিন্‌তে পার কি?"

তখন আর ভ্রম রহিল না। গোবরডাঙ্গার হাটের সেই উদার মিষ্টান্নদাতাকে মুখোপাধ্যায় একটু একটু করিয়া চিনিয়া ফেলিলেন। নামটি মনে ছিল না, কিন্তু তাতে মদকপুত্রের সম্বোধন কখন বাধে না। মহা-কৌতূহলী লইয়া বিনোদ হাঁকিলেন, "ময়রার পো, এ বেশে তুমি এখানে?"

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান কহিল, "ঠাকুর, আমার কেই বা আছে? একটা মেয়ে বই ত নয়। তাই দোকান তুলে দিয়ে হরিনাম করে বেড়াচ্চি। কিন্তু ঠাকুর, এ জঙ্গলে তুমি কেন? এখনও ত তোমার বনে যাওয়ার বয়স হয় নি!"
— এই কথার সুরে ব্যঙ্গ যতটা মিশ্রিত ছিল, কৌতূহল ততটা ছিল না। কিন্তু বিনোদ ব্যঙ্গ বুঝিলেন না। আট দশ দিনের নির্জ্জন বন্দীজীবনভোগের পর সহসা এক জন পরিচিত লোকের দেখা পাইয়াছেন, মনটা স্বতঃই সহানুভূতিলাভের জন্য ব্যাকুল হইল। তিনি সংক্ষেপে আপনার

বিপদের পরিচয় দিলেন, এবং তাঁহার অনুমানে বিশ্বনাথই যে তাহার মূল, ইহাও নবাগত পুরাতন বন্ধুকে বিশ্বস্তভাবে জানাইতে ভুলিলেন না। কিন্তু গোড়ার কথা কিছু বড় বলিলেন না, বিশ্বনাথের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ভগবান মনে মনে হাসিল। গম্ভীর মুখে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুধাইল, টাকা কড়ি বেশী কিছু সঙ্গে ছিল না?

বিনোদ মাথা নাড়িলেন।—"না।"

ভগবান। তবে এ কি রকম হলো ঠাকুর? বিশে ডাকাত নিরীহ বামুনকে কষ্ট দেবার লোক ত নয়। ঠাকুর আপুনি ভুল বুঝেচো। বিশে ডাকাতের এ কাজ নয়। আর সে তোমায় এমন বন্ধ করে রাখ্‌বে কেন? কারু সঙ্গে বুঝি তোমার শক্রতা আছে ঠাকুর? শত্তুরের এ কাজ!

বিনোদ ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন, "এমন শক্রতা আমার কখন কারু সঙ্গে নেই ময়রার পো! গরিব ব্রাহ্মণ আমি, ভিক্ষা করে সংসার চালাই, বিঘে কতক ব্রহ্মোত্তর মাত্তর পুজি। কারু সঙ্গে বিবাদ করি নে—কেনই বা করব?"

ভগবান শূন্যে দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "কখন কি কারু মনে কষ্ট দাও নি ঠাকুর? কটু কথা বলে হোক, গাল মন্দ দিয়ে হোক, কারু প্রাণে কখন কি ব্যাথা দাও নি?"

এবারে বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন। কেন না, সেই প্রত্যাখ্যানের রাত্রি হইতে মর্ম্মপীড়িতা বালিকার শেষ কথা শেলবৎ তাঁর হৃদয়ে বাজিতেছিল। যখন তখন মানস-নেত্রে তিনি সরলার সে অভিমানিনী সিংহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, দৈববাণীবৎ যখন তখন শ্রুতিপথে ধ্বনিত হইত—"এই স্বামী, এই অধার্ম্মিক আমার দেবতা!" বিনোদ মুখ নত করিলেন, ভগবানের দিকে চাহিতে পারিলেন না। তাঁর মনে হইতেছিল, লোকটা তাঁহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত নখদর্পণে দেখিতে পাইতেছে।

ভগবান তাঁহার উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া আবার বলিল, "ঠাকুর!

আমার দোকানে বলেছিলে, তোমার ছোট স্ত্রীটি তোমার বাড়ী গেলে ঝাঁটা মেরে তাকে তাড়িয়ে দেবে। তা ত করনি ঠাকুর? সতী সাধ্বীর ত কোন অপমান করনি?"

বিনোদ লজ্জায় মরিয়া গেলেন। অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত যে দৈন্য, তার সঙ্গে খানিকটা সামাজিকতা জড়িত আছে। কিন্তু হৃদয়ের দৈন্য নিতান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার, একবার অনুভূত হইলে মানুষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। অনেক ক্ষণ বিনোদ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ পরে সহসা ভগবানের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি মানুষ না দেবতা আমায় ছলিতে এসেছো?"

ভগবান মৃদু হাসিল, কোন উত্তর করিল না। তখন বিনোদ আপনা হইতে বিশ্বনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের আমূল বৃত্তান্ত বলিয়া গেল—কোন কথা লুকাইল না। শেষে বলিল, "ময়রার পো, আমার পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েচে, কিন্তু এখন ভাবি কি যে, যদি একবার কোন মতে তার দেখা পাই, সর্ব্বস্ব দিয়েও তার মনঃকষ্ট দূর করি। সত্যিই তুমি বলেচো, সতী সাধ্বীর অপমান করেই আমার এ দশা হয়েচে।"

ভগবান সুধাইল, "ঠাকুর, এখানে তোমার কষ্টটা কি? কই, কয়েদের ত কিছুই দেখ্চি নে। বেশ নিরিবিলি একলা আছ। কষ্ট কি ঠাকুর? সেবার কোন ত্রুটি হয় কি?"

বিনোদ। "না, সে কষ্ট কিছুই নেই। সেবার কথা যদি বল্লে, সে সম্বন্ধে রাজার হালে আছি ময়রার পো! কিন্তু সোণার খাঁচায় পাখীর মতন—বাইরে এক পা বেরুতে পাইনে। ঐখানে একটা সুড়ঙ্গ আছে। প্রাতে উঠে দেখি, যা কিছুর দরকার সব কে রেখে গেছে। পায়ের শব্দও যে না পাই, তা নয়। কিন্তু কারু কথা শুন্তে পাই নে। সেই রাত্রে যারা এখানে আমায় রেখে গেল, তারা শাসিয়ে গেছে, এ বাড়ী ছাড়া এক পা গেলেই আমার মরণ নিশ্চয়। ভাই, কয়েদ আর কাকে বলে বল?"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে সেই সুড়ঙ্গের দিকে একটা উচ্চ হাস্য শুনা গেল। অমানুষ কণ্ঠে কেহ বলিল, "ইচ্ছা হয়, বৈরাগীর সঙ্গে যাও, কিন্তু খবরদার, তাকে না বলে পালিও না, তা হলে প্রাণে বাঁচবে না।"

বিনোদের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। করযোড়ে বলিলেন, "যে হও বাবা তুমি, আশীর্ব্বাদ করচি। আমি এই মস্করার পোর বিনা অনুমতিতে কোথাও যাব না—কোন কাজ করব না।"

ভগবান গাহিতে গাহিতে চলিল,

"তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি।"

বিনোদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ব্যাপারটা তাঁহার নিতান্ত ভৌতিক রকমের বোধ হইতেছিল।

উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে সামুয়েল ফেডি সাহেবের নীলকুঠী। তিনি বিবাহিত, এবং সস্ত্রীক সেখানে বাস করেন। বিস্তৃত নীল-ক্ষেত্র সকল নদীতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া সাহেবের প্রবল প্রতাপ এবং ধনগৌরব সূচিত করিতেছে। মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট্ সাহেবের সঙ্গে ফেডি সাহেবের বড় সৌহার্দ্দ্য; কালীপূজার ছুটীতে দুই জনে শীকার খেলিতে বাহির হইয়াছেন। ফিরিয়া রাত্রে আজ রাজবাড়ীতে উভয়কে সস্ত্রীক ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে।

ফেডি সাহেব শীকারে গেলেন বটে, কিন্তু অন্য দিনের মত তেমন হৃষ্টচিত্তে পশু পক্ষীর শোণিতদর্শনজনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছিলেন না। প্রভাতে কলিকাতা হইতে টাকার চালান আসার পরই

তাঁহাকে বাহির হইতে হইয়াছে, দস্যুসঙ্কুল দেশে ধনরক্ষার উপযোগী কোনও ব্যবস্থাই করা হয় নাই। ইলিয়ট্ মাঝে মাঝে ফেডির অন্য-মনস্কভাব লক্ষ্য করিলেন, এবং শেষে তাহার কারণ শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। নন্‌সেন্‌স্ ফেডি, ইংরেজ রাজ্যের ভিত্তি কি এতটা দৃঢ় নয় যে, একজন ইংরেজের কুঠী নেটীভদের বুকে ভয় সঞ্চার করবে না? বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের কাছারীর এক মাইলের মধ্যে? ফেডি সাহেব শুষ্ক হাস্য করিয়া লজ্জিত হইলেন।

অতএব কলিকাতা হইতে যে কয় জন তেলেগু সিপাহী টাকার চালান আনিয়াছিল, কুঠীর ধনাগার তাহাদের জিম্মায় রহিল। আর কোন ব্যবস্থা করা হইল না।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

রাজবাটীতে দেওয়ালীর ভোজ খাইয়া সস্ত্রীক কুঠীতে ফিরিতে ফেডি সাহেবের রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিল। কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীর ঘোর তিমির ভেদ করিয়া তদীয় আলোকচক্ষু বগী যখন তীরবেগে রাজপথ অতিক্রম করিতেছিল, সাহেব তখন মুহুর্মুহু চারি দিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। দেখিয়া মেমসাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফেডি কতকটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, এবং হৃদয়ভাগিনীকে মনের কথা খুলিয়া বলিলে কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে ভাবিয়াই তাহা করিলেন না। ইহার একটু কারণও ছিল। ভোজন-টেবিলে বসিয়া ইলিয়ট সাহেব দস্যুভীতির ইঙ্গিতে তাঁহাকে একবার বিদ্রূপ করিয়া সমবেত মহিলা কয় জনের কলকণ্ঠে মধুর হাস্যরস উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন।

কুঠীতে পৌঁছিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে না করিতে ফেডি সাহেব

খাজানাঘরের দিকে একটা পিস্তলের আওয়াজ শুনিলেন। সহসা আস্তাবলে একটা গোলযোগ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার মুক্তবন্ধন অশ্বচতুষ্টয় খুরশব্দে নদীতট কম্পিত করিয়া চকিতে কোথায় অন্তর্হিত হইল। ফেডি বুঝিলেন, তাহারা সুদক্ষ অশ্বারোহীর হাতে পড়িয়াছে।

এদিকে খাজানারক্ষক তেলেগু সিপাহীকে পিস্তলের গুলিতে হত করিয়া ডাকাতেরা বাকী লোকগুলাকে শয়ানাবস্থাতেই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। খাজানার ঘর নির্ব্বিবাদে লুণ্ঠিত হয় দেখিয়া স্বয়ং ফেডি সাহেব অস্ত্রাগারের দিকে ছুটিলেন। দেখিলেন, দ্বাররোধ করিয়া কেহ সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। নৈরাশ্যে ক্রোধে অধীর হইয়া ফেডি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং শয়নাগারে ফিরিয়া গেলেন। ভরসা, একখানা কিরীচ সেখানে ঝুলিতেছিল।

মিসেস্ ফেডি আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া কোথা হইতে একটা কালো হাঁড়ি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলোর অদূরে দীঘিকার কাল জলে নীহারিকা-ছায়া স্পন্দিত হইতেছিল। অকস্মাৎ দীর্ঘিকার সে সুষুপ্তিশান্তি ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে মিসেস ফেডি মাথায় কালো হাঁড়ি আবৃত করিয়া সরোবরজলে প্রবেশ করিলেন।

ফেডি সাহেব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে না করিতে ৫।৭ জন লাঠিয়াল তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। সাহেব তরবারি সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই দস্যুহস্তে বন্দী হইলেন। বাহিরের সেই সশস্ত্র পুরুষ তীক্ষ্নস্বরে বলিয়া উঠিল,—"সাহেবকে বেঁধে রাখ, কিন্তু খবরদার! মেমসাহেবের ঘরে যাস্‌নে।" ফেডি বন্ধনদশায়—ডাকাতেরা পেছমোড়া করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল—ঘাড় ফিরাইয়া বক্তাকে দেখিলেন; বলিলেন, "thanks! কে তুমি?"

বক্তা কহিল, "আমি ডাকাত বিশ্বনাথ বাবু। গরিবদের মেয়ে

সাহেব বিস্তর টাকা তোমরা উপার্জ্জন কর। কিন্তু গরিবেরও মা বাপ আছে সাহেব! আমার ভাগ আমি নিতে এসেচি।”

সাহেব বলিলেন, “আমরা দেশের রাজা। যদি রাজাকে ভয় থাকে, এখনও এ দুষ্কার্য্য হ’তে নিবৃত্ত হও। আমার হুকুমও যা, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমও তা! এখনও বল্‌চি পালাও।”

হো হো করিয়া ডাকাতেরা হাসিয়া উঠিল। হাসিল না কেবল বিশ্বনাথ। সাহেব হাঁকিলেন, “চুপ্‌ রও শূয়ার কি বাচ্চা!” থানকতক লাঠি প্রত্যুত্তরে তাঁহার পিঠে পড়ি-পড়ি করিতেছিল। বিশ্বনাথ মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল। “খবরদার! বাঁধা মানুষকে মারিস্‌ নে।” ফেডিকে সম্বোধন করিয়া বলিল “সাহেব, গালিগালাজ করো না। আমি চল্লাম। প্রাণের যদি মায়া থাকে, লেঠেলগুলোকে কিছু বলো না! মেমসাহেবের জন্য তোমার কোনও ভাবনা নেই সাহেব।”

তখন মেঘাকে মাত্র সাহেবের পাহারায় রাখিয়া বিশ্বনাথ অন্য ডাকাতদের সে কক্ষ ত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিল।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

শেষরাত্রে বাগ্দেবীর খালের জঙ্গলে সদলে বিশ্বনাথ অপেক্ষা করিতেছিল! চারি দিকে দূরে দূরে আরণ্য অন্ধকার মধ্যে “ঘাটি” বসিয়া গিয়াছে;—বাছা বাছা সড়কিওয়ালা এবং লাঠিয়ালের দুর্জ্জয় দুর্গ। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে বসিয়া জন কয়েক কালীর পাইক সঙ্গে বিশ্বনাথ সোৎসুকে মেঘা ও তাহার সহচরদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। স্বয়ং দলপতি লুণ্ঠিত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া পূর্ব্বেই রওনা হইয়া আসিয়াছিল; বামাল নিরাপদ না জানিলে মেঘা

নীলকুঠীর "ঘাট" উঠাইবে না, ইহাই ভিতরের কথা। কিন্তু বিশ্বনাথ টাকাগুলোর কিনারা করিয়া সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলেও মেঘা আসিল না। এদিকে রাত্রিও বেশী ছিল না। উদ্বিগ্ন হইয়া দলপতি নীলকুঠীতে ফিরিবার সংকল্প করিতেছিল।

এমন সময়ে একখানা খাটুলি সঙ্গে সদলে মেঘা দেখা দিল। বিস্মিত বিশ্বনাথ আলোকসহায়ে দেখিল, বন্ধনদশায় ফেডি সাহেব তাহাতে শয়ান;—নাগপাশবদ্ধের মত অঙ্গমাত্রসঞ্চালনে অশক্ত। মহা বিরক্তি হইয়া দলপতি মেঘার দিকে চাহিল। বুঝিয়া মেঘা কহিল, "তুমি স্পষ্ট করে ওকে ছেড়ে আস্তে বলনি। আমিও ছেড়ে আসা ভাল মনে করিনি। এই কেউটের বাচ্চা ছেড়ে দিলে ক'দিন আমরা বাঁচব বল? আমার কাজ আমি করেচি, এখন তোমার যা ভাল মনে হয় কর।"

মেঘা এক পাশে গিয়া বসিল। তখন কালীর পাইকেরা একবাক্যে বলিল, "সাহেবটাকে মেরে ফেল। ওকে ছাড়লে একদিনও আমরা বাঁচব না।"

বিশ্বনাথ ধীরভাবে বলিল, "সাহেব মারলে তোরা বাঁচবি, কি ছেড়ে দিলে বাঁচ্‌বি? একটু ভেবে কথা কোস্! সাহেব ঘাঁটিয়ে নবাব বাদ্‌সারা উচ্ছন্ন গেল—প্রাণে মেরে আমরা বাঁচব? কি ভুল! তা হবে না। ওর বাঁধনগুলো কেটে দে। তার পরে চোক বেঁধে দিয়ে সীমানা পার করে দিয়ে আয়।"

পাইকেরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—দলপতির আদেশটা কাহারও ভাল্ লাগে নাই। মেঘা বলিল, "বিশু!" আমার কথা শুনে যদি বদেকে মেরে ফেল্‌তে, এত বিপদ হতো না। সাহেবটাকে ছেড়ে দিলে যত বিপদ, মারলে তার সিকিও নয়। নবাব বাদসাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। আজ আমরা ডাকাত, কাল গেরস্ত চাষী। কে মার্‌লে ঠিকানা কি? তুমি দল নিয়ে চলে যাও, ও ভার আমার থাক্। এক

ফোঁটা রক্তও আমি মাটীতে পড়তে দেব না।" মিতভাষী মেঘা দলের মধ্যে রক্তপিপাসুদের অগ্রগণ্য। কথা শেষ করিয়া সে কোষ হইতে তীক্ষ্ণধার তরবারি উন্মুক্ত করিল।

এই কথায় কালীর পাইকেরা সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "সাহেবটাকে না মার যদি, আমাদিকে মার। তোমার হাতে মরি সে ভাল, নইলে ফিরিঙ্গীগুলো যে ধরে ধরে ফাঁসি লট্‌কে দেবে, তা হবে না। তুমি মা-কালীর বরপুত্তুর, তোমার কে কি করবে? মর্‌তে কুকুর বিড়ালের মত আমরাই মরব। শেয়াল কুকুরেরও এর পরে আমাদের দুঃখে কাঁদ্‌বে।" লোষ্ট্রাহত মধুচক্রবৎ দস্যুদের অস্ফুট অসন্তোষবাক্যে বন শব্দিত হইয়া উঠিল।

বিশ্বনাথ ইহাতে কিছু উদ্বিগ্ন হইল। সে নীরবে ভাবিতে লাগিল। মেঘা ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিল,—বুঝিল দলপতি ইতস্তত করিয়া কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছে না। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মেঘা মুক্ত অসি হস্তে ফেডি সাহেবের প্রতি ধাবিত হইল—আলোকসম্পাতে তীক্ষ্ণধার ফলক প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। ফেডি ডাকাতদের কথা শুনিতে বুঝিতে পারিতেছিলেন—কুটিল দৃষ্টিতে তাহাদের গতিবিধি ঠিক এক বার দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। উদ্যত-অসি ঘাতককে দেখিয়া সহসা তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মেঘার এই হঠকারিতার জন্য বিশ্বনাথ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং দার্ঢ্যবলে অন্যদিন মা ভবানীর বরপুত্র বলিয়া দস্যুমহলে সে পরিচিত ছিল, এই মুহূর্ত্তে সহসা তাহা জয়যুক্ত হইয়া

উঠিল। ফেডি সাহেবের আর্ত্তনাদ কর্ণগোচর হইতে না হইতে দস্যুপতি পার্শ্ববর্ত্তী দীর্ঘ যষ্টিখণ্ড সংগ্রহ করিল, এবং তাহাতে ভর দিয়া এক লাফে খাটুলির পার্শ্বে উপস্থিত হইল। মেঘার উদ্যত অসি সবেগে আসিয়া তাহার মাথার উপর পড়িল বটে, কিন্তু তাহা ঘূর্ণমান লাঠিতে প্রহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে বিশ্বনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ব্যর্থলক্ষ্য মেঘা অধোবদনে স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

বিশ্বনাথ কোন রাগ প্রকাশ করিল না। প্রশান্ত স্মিতমুখে কালীর পাইকদের ডাকিয়া বলিল, "সাধ থাকে আয়, এই শেষ দিন আমার তরওয়ালের বল পরীক্ষা কর্! আজ আমি এক দিকে, আর তোরা এই জঙ্গলে জমায়েৎ আছিল্ পাঁচ শ' জওয়ান এক দিকে! আমি এই সাহেবটার বাঁধন কেটে দিচ্চি, সাহস থাকে ত আয়, দেখি কে কি করতে পারিস একবার!" তখন বিশ্বনাথ ক্ষিপ্রহস্তে দৃঢ়সংকল্পে ফেডিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বসাইল।

নীরবে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই দস্যুসেনা দলপতির আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল! মশালের আলোকে বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, বিশ্বনাথের প্রতি বাক্যে, প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে, অমানুষী নির্ভীকতা এবং দৈববল সূচিত করিতেছিল। সে মোহ,—যার মহিমার মানুষ যথার্থ মহত্ত্বে দেবত্ব আরোপিত করিয়া প্রতিভার পদে আত্মসমর্পণ করে,—তাহাই আসিয়া অকস্মাৎ বিদ্রোহোন্মুখ রোষচঞ্চল দস্যুদলে কুহক বিস্তার করিল। বিশ্বনাথ গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলিল,

"চুপ করলি কেন রে? এতক্ষণ ত ভারি গজ গজ লাগিয়েছিলি! আমার হুকুমে এতই যদি হতশ্রদ্ধা, তোরা এক সঙ্গে সবাই আমায় ছেড়ে যা। আমার 'যাঁহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন'। কথায় বলে,—'মরণের বাড়া গাল নেই,' সেই মরণকে কখন ডরাই দেখেছিস্? যতক্ষণ মা কালী প্রসন্ন আছেন, বিশে এ দুনিয়ার কাউকে গেরাহি করে না!

তাঁর অকৃপা যদি হয়ে থাকে, আমি ডুবলাম বলে। তোরা রক্ষা কর্‌তে পার্‌বিনে!”

বিশ্বনাথ প্রতি কথায় শ্রোতাদের হৃদয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করিতেছিল। কালীনাম শুনিবামাত্র বনস্থল কম্পিত করিয়া ডাকাতেরা একবাক্যে গাহিয়া উঠিল, “কালী মায়ী কি জয়! বিশ্বনাথ কি জয়!”

মেঘা আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “বিশু, তুমি এত অভিমান কববে, তা জান্‌তাম না। যা হোক্, আমার কসুর মাফ করো। তোমার নিমকে আমাদের শরীর, যতক্ষণ বেঁচে আছি, তোমায় আমরা ছেড়ে যাব, সন্দেহ করো না। সাহেবটাকে তোমার অজান্তে কেটে কুটে আমি আপদ চুকিয়ে দেবার ফিকিরে ছিলাম। এখনও তোমার মিনতি করচি, আমার কথা ভেবে দেখ। এই ফিরিঙ্গী-বাচ্চা ছাড়া পেলে, তোমার সর্ব্বনাশ হবে!”

বিশ্বনাথ একটু চিন্তিত হইল—কিন্তু সে নিমেষের জন্য। মেঘার কথার উত্তর না দিয়া ফেডিকে কহিল, “সাহেব, ভাগ্যে ভাগ্যে তুমি বেঁচে গেছো। পরমেশ্বর রাখ্‌লে মারে কে?” সাহেব কলের পুত্তলীর মত বিশ্বনাথকে ধন্যবাদ দিলেন।

দলপতি আবার বলিল, “সাহেব, দলের লোকেরা তোমায় ছাড়তে চায় না, কিন্তু আমি যখন বলেচি ছাড়্‌ব, আমার কথা খেলাফ হবে না। আমি থাক্‌তে তোমার কোন ভয় নেই। কিন্তু একটি কড়ার কর্‌তে হচ্চে সাহেব। তোমায় পরমেশ্বর সাক্ষী কসম নিতে হবে, বাপ মা, ভাই বন্ধু, যে কেউ তোমার পেয়ায়ের জিনিস আছে, সব্বাইর কসম নিয়ে বল্‌তে হবে, আজকের এই ডাকাতি নিয়ে তুমি কোনও গোল করবে না, কখনও আমাদের কোনও অনিষ্ট কি তার চেষ্টা করবে না।”

বিশ্বনাথের মনুষ্যোচিত ব্যবহার এবং সেই যমদূতের মত ডাকাত-গুলোর উপর তাহার প্রভাব দেখিয়া ফেডি সাহেব বুঝিয়াছিলেন তাহার

আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। মুক্তির আশায় কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া তিনি মিশ্রিত হিন্দী বাঙ্গলায় বলিলেন, "কসম লইতে আমি প্রস্তুত আছি!"

মেঘা পরিষ্কার হিন্দীতে বলিল, "দলপতি, তোমারি পায়ে ধরে বল্‌চি, ফিরিঙ্গীর কসমে ইৎলাদ্ করো না! কোন্ ফিরিঙ্গী আজ্ পর্য্যন্ত কথা ঠিক্ রাখ্‌তে পেরেছে? পলাসীর লড়াইয়ের কথা কি ভুলে গেলে? শোননি কি যে, ক্লাইব সাহেব জাল করতেও পিছপাও হয় নি?"

বিশ্বনাথ মেঘার কথায় কর্ণপাত করিল না। ফেডিকে বলিল, "সাহেবদের উপর বরাবর আমার বিশ্বাস আছে। কোথায় কোন একটা সাহেব কি মন্দ কাজ করেচে, তার জন্য ইংরেজ জেতের দোষ হ'তে পারে না। তারি জন্যে আজ্ পর্য্যন্ত আমি পারতপক্ষে তোমাদের শত্রুতা করি নি। তোমরা নীলকুঠিয়ালরা কিন্তু গরিবের উপর বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেচো, তাই তোমার টাকায় আজ্ ভাগ বসালাম সাহেব। সে যা হোক্, বেশ ভেবে চিন্তে দেখ, প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারবে কি না। আমি যখন তোমায় অভয় দিয়েছি, ছেড়ে দেবই দেব, কসম নাও, আর না নাও। দেখা যাবে, তোমার ধর্ম্ম কেমন।"

ফেডি নির্ভাবনায় বলিলেন, "কসম নিতে আমি এখুনি প্রস্তুত! বল কি বল্‌তে হবে।"

বিশ্বনাথ একবার মেঘার দিকে কোমল কটাক্ষ করিল। প্রভুভক্ত কুকুরের মত সে মহা উদ্বেগে উন্মুখ হইয়া দলপতির প্রত্যেক বাক্য শুনিতেছিল। বিশ্বনাথ হিন্দীতে বলিল, "বল সাহেব, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের যে পরমেশ্বর, তাঁর কসম, তোমার পিতা মাতার কসম, আমাদের আজ্‌কের কাজের জন্যে তুমি কোনও মামলা মোকদ্দমা করবে না, কখনও আমাদের কোন অনিষ্ট কি তার কামনা করবে না।"

ফেডি সাহেব একটি একটি করিয়া এই শপথের প্রত্যেক কথা পুনরুক্ত

করিলেন। বিশ্বনাথ বলিল, "সাহেব! তুমি মুক্ত হলে, কিন্তু একাকী এখন তোমায় যেতে দেওয়া ঠিক্ নয়। চল, আমি তোমায় বন পার করে দিয়ে আসি।"

মেঘা যুক্ত করে বলিল, "কিন্তু একটা কথা রাখ। সাহেবকে ছেড়েই যদি দিলে, ও চোক বেঁধে দাও, আমি ওকে পৌছে দিই। আল্লার কসম! ওর গায়ে কাঁটার ছড়ও লাগতে দেব না। তুমি চোক খুলে ওকে পথ দেখিয়ে যেও না।"

বিশ্বনাথ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। স্নেহকোমলস্বরে বলিল, "মেঘু, মানুষকে অত অবিশ্বাস করতে নেই। সাহেব জাতটেকে তুই চিনিস্‌নে মেঘু। কিছু মনে করিস্ নে!"

তখন দলপতির সঙ্কেতবাক্যে বিচ্ছিন্ন ডাকাইত দল চকিতে সারি দিয়া দাঁড়াইল, এবং দলে দলে বিভক্ত হইয়া সহসা সেই নৈশান্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

এই ডাকাতির কয় দিন আগে ভগবান মাঠাকুরাণীদিগকে গঙ্গাতীরের নূতন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। মীরার ইচ্ছা দিন, যথাবিধি গৃহপ্রতিষ্ঠার পর সেখানে বাস করেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন ভগবান দ্রব্যাদি নূতন গৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া বসিল। মীরা ও সরলা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিল, "মা, গঙ্গাতীরে আবার দিন ক্ষণ দেখা কি? এ ডাকাতের বাড়ী; বিশ্বনাথের শত্তুর বিস্তর, আমি সব সময় থাকিনে। কি জানি, কোম্পানির লোক কখন খানাতল্লাসী করতেই যদি এলো!" কাজেই মাঠাকুরাণীরা দ্বিরুক্তি করিলেন না। নূতন বাড়ীতে মীরা ও সরলা যোগা-ম্বর সঙ্গে বাস করিতে লাগিল। ভগবান স্বরূপগঞ্জের আড্ডাতেই রহিল—

সব দিন মাঠাকুরাণীদের দেখা দিতে পারিত না। পীতাম্বর ২।৪ দিন অন্তর দিদিকে দেখিয়া যাইত।

নীলকুঠীর ডাকাতির দিন সন্ধ্যাকালে ভগবান আসিয়া মীরা ও সরলার সঙ্গে দেখা করিল। সরলা বড় লাজুক, ভগবানের মধুর চরিত্রগুণে তাহাকে ভক্তি ও স্নেহ যথেষ্ট করিত বটে, কিন্তু বুড়ো মানুষটো যে মা মা করিয়া অস্থির করে, সেটা ভারি জুলুমের কথা। "ভাল আছ মা?" বলিয়া ভগবান যখন প্রণাম করে, তখন মুখ নত করিয়া কোনরূপে সরলা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, "তুমি কেমন আছ?" তার পর ভগবান আরম্ভ করে, "দূরে পড়েছি বলে ভুলিস্‌নে মা, কই ছেলেকে কখন হাতে করে কিছু ত খেতে দিলিনে্।" লজ্জায় সরলা কথা কহিতে পারে না, দিদির কাণে কাণে বলে, "ছেলেকে আজ না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না দিদি!"

সন্ধ্যায় সাক্ষাৎকালে বড় মা এবং ছোট মাকে প্রণাম করার পর শোয়োক্তাকে গৃহান্তরে পাঠান ভগবানের অভিপ্রেত। সে জন্য যোগাম্বরকে বহির্ব্বাটী হইতে ঠিক করিয়া আনা হইয়াছে। আজ খাওয়ার জন্য ভারি আবদার করায় মীরা ভগবানকে বলিল, "সরলা বলে, ছেলের খাওয়ার খোঁটাটা মিছিমিছি, কেবল লজ্জা দিতে। কই একদিনও ত খান না। কারু হাতে বুঝি খান না?" সরলা মীরাকে টিপিল—আজ "কিছুতে ছেড়ো না দিদি!" ভগবান হাসিল। "কারু হাতে খাইনে বটে, কিন্তু তাই বলে কি মার হাতেও খাব না? আচ্ছা ছোট মা, তুমি রাঁধ, খেয়ে আমি যাব।" অতএব সরলা রন্ধনের উদ্যোগ করিতে গেল।

ঐইখানে বলা আবশ্যক, বিনোদবিহারীর সংবাদ ভগবান সকলই জানিত বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মীরাকেও সে কথা কিছু বলা হয় নাই। বিশ্বনাথের মতলব ছিল, দীর্ঘকাল বিনোদকে বন্দীভাবে রাখিয়া প্রত্যাখ্যাতা নিরপরাধা পত্নীর সহিত মিলিত করিবে। কিন্তু চারি দিকে বিপদ

ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সাধ বুঝি পূর্ণ হয় না। সেই জন্য বিশ্বনাথ "খুড়োর" হাতে সে ভার ন্যস্ত করিল। ভগবান আহ্লাদের সহিত ব্রতটি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু বিশুকে বলিল, "তুই কি ভাবচিস্, আমি নিরাপদে থাকব? আমি মনঃস্থির করে বসে আছি। তোর কি দলের আর কারুর খবর আমি প্রাণান্তে বলব না বটে, কিন্তু নিজের কথা কিছুই লুকোব না বিশু! আমায় যদি ধরে, পাপ লুকিয়ে রেখে এই বুড়ো বয়সে আমি বাঁচবার কোনও দরকার দেখ্‌চিনে।"

এই সন্ধ্যাকালে মীরা ও যোগাম্বরের সঙ্গে ভগবানের যে কথোপকথন হইল, তাহা আমরা আপাতত গোপন রাখিব।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

শয়ন করিয়া মীরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে দিন সরলার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন। দেখা হইলে সরলা মীরার প্রশ্নমতে স্বামীর প্রত্যাখ্যানের গল্প করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে এত সংক্ষেপে যে, বিনোদের প্রকৃত দুর্ব্যবহারের কোনও কথা তাহাতে প্রকাশ পায় নাই। সরলা মীরাকে দিদি বলিত, কিন্তু মাতার সমবয়স্কা বলিয়া সকল বিষয়ে জননীর মত তাঁহাকে সমীহ করিত। কাজেই তাহার স্বামীগৃহের সবিশেষ সংবাদ এতদিন মীরার জানা ছিল না।

সন্ধ্যায় ভগবানের কাছে আসল কথা শুনিতে পাইয়া মীরা বড় মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছিলেন। বালিকার নিতান্ত শিশুর মত সরলতা, লজ্জাবতী লতার মত তার সদাই সঙ্কোচভাব, অথচ স্নেহমায়ায় পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র তাহার হৃদয়টুকুতে ইহারই ভিতর পিতৃহীনা শোকবিহ্বলা মীরা বাঁধা পড়িয়াছিলেন। স্বামীনিন্দাভয়ে সাধ্বী যে তাঁর কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলে

নাই, ইহা ভাবিয়া তিনি তাহার চরিত্রসৌন্দর্য্যে অধিকতর মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথায় কথায় সরলাকে বলিলেন, "বোন, বিনোদ তোমার উপর অমন দুর্ব্যবহার করেছিলেন, তা আমি এতদিন জানতাম না। আয়ি বুড়ী হয় ত বল্‌তো, কিন্তু আমি বাড়ী থেকে আসার দু' দিন পরেই সে দেবীপুর গেল। সব কথা আজ ভগবানের কাছে শুন্‌লাম।" সরলা কোনও উত্তর দিল না, লজ্জাতেও বটে, মনঃকষ্টেও বটে উপাধানে মুখ লুকাইল। দেখিয়া মীরা চক্ষু মুছিলেন। করুণকণ্ঠে কহিলেন, "না সরলা, তোমার কাছে আমি কিছু শুন্‌তে চাইনি। আমি জানি, লজ্জায় আমায় সব কথা তুমি বল্‌তে পার নি—কেমন ?"

বিবশা বিহ্বলা হইয়া সরলা উপাধানে অশ্রুপাত করিতেছিল। কিন্তু মীরা অপ্রতিভ হইবেন ভাবিয়া সহসা আত্মসংবরণ করিল। বলিল, "দিদি, মা বল্‌তেন, সরলা, যদি কখন শ্বশুরবাড়ী যাস্‌, দুটো কথা মনে রাখিস্‌ মা!—সোয়ামীকে আপনা থেকে কখন কিছু চাস্‌নে, হাজার কষ্টেও সোয়ামীর নিন্দে করিস্‌নে!" অনেক চেষ্টা করিয়াও সরলা এবার চোখের জল থামাইতে পারিল না। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া গাঢ় স্বরে আবার বলিল, "দিদি, আমি জান্‌তাম, সোয়ামী স্ত্রীলোকের দেবতা! কুক্ষণে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলাম দিদি! এখন আর মনকে প্রবোধ দিতে পারিনে।"

এই কথা কয়টিতে মীরা সতীহৃদয়ের দারুণ বেদনা অনুভব করিলেন। গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ছি বোন্‌, ও কথা ভাবতে নেই। সোয়ামী সুখে দুঃখে চিরদিনই মেয়েমানুষের দেবতা। তুমি কি শোননি, সতী ভগবতী বাপের মুখেও পতিনিন্দা সইতে পারেন নি? দুঃখু কি বোন্‌, সোয়ামী স্ত্রীতে অমন মনান্তর সব ঘরেই হয়! তুমি যদি অত ছেলেমানুষী করে তখনই চলে না আস্‌তে, বরকনেতে সেই রাতেই ভাব হয়ে যেত!

শেষের কথায় কিঞ্চিৎ হাস্যরস যোগ করিয়া মীরা সরলার মনটা

একটু ভিজাইতে চেষ্টা করিলেন ;—কেন না, আসল কথাটা তখনও বলা হয় নাই। সরলাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার তিনি বলিলেন, "দেখ সরলা, তোমার যে বয়স, আমার মতন গঙ্গাবাস চিরদিন তোমার পোষাবে না বোন। বিশেষ, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বরাবর থাকৃতে পারব না। সোয়ামীর দোষ ভুলে যাও। আমি খবর পেয়েছি, বিনোদ এই অঞ্চলে এখন আছেন। তোমার সম্মতি পেলেই কল কৌশল করে আমি এখানে তাঁকে আনতে পারি।"

সরলার মনে প্রত্যাখ্যানের সেই কালসন্ধ্যা জাগিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। স্বামী যে প্রথম সম্ভাষণেই তাহার সতীত্বগর্ব্বে আঘাত করিয়াছিলেন, সে অপমান বালিকা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। সে সব কথা মনে পড়িবামাত্র সরলা বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল ; স্থির কণ্ঠে বলিল,—"না দিদি, আমার সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল! তুমি আশ্রয় না দাও, আমার সেই দেবীপুরের ভিটায় ফিরে যাব, না পারি, মা গঙ্গার কোলে শুয়ে চোক বুজব! ও সব কথা আমায় আর বলো না দিদি!"

মীরা করুণার হাসি হাসিয়া বলিল,—"বাবুজী বল্‌তেন, 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দ লালা!'—কে এক পশ্চিমে বাই—আমার নামে নাম,—তারি নাকি এ গান! মীরা নাম মনে পড়্‌লে সর্ব্বদা নন্দলালকে মনে থাকৃবে বলে, তিনি এ হতভাগীর এ নাম রেখেছিলেন। যখন তখন বল্‌তেন, 'মীরা কহে, বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা!' ভাই, বিনা প্রেমে জগতের যিনি পতি তাঁকে পাওয়া যায় না ; তুমি কখনঁ দেখলে না শুন্‌লে না, একেবারে স্বামীপ্রেম পাবে! আমার অনুরোধ রাখ দিদি! সহগুণে পৃথিবী বশ। ঢিল খেয়ে পাট্‌কেল মারা পুরুষের শোভা পায়। মেয়েমানুষের প্রতিশোধ ও পথে নয় বোন্! প্রেম ছাড়া আমাদের পথ নেই।"

বালিকা সরলা অত কথা বুঝিল না। দলিতফণিনীবৎ প্রত্যাখ্যানের নিশিতে বিনোদকে শুনাইয়া বলিয়াছিল, "এই স্বামী? এই আমার দেবতা!" আজও মনে মনে সেই কথা বলিল। প্রকাশ্যে বলিল,— "না দিদি, কোথাও তুমি লোক পাঠিও না! আমার সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল দিদি!"

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সেই নিশাপ্রভাতে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ হোড়ঙ্গের বনে প্রবেশলাভের পূর্ব্বে বিশ্বনাথ ফেডি সাহেব সঙ্গে আড্ডার অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধনের দরুণ ফেডির সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, তাহাতে উপলকণ্টকময় সঙ্কীর্ণ পথ; কষ্টে তিনি পথপ্রদর্শকের অনুগমন করিতেছিলেন। কষ্ট যত হোক্, ইহাতে তিনি বেশ ভাল করিয়া পথ ঘাট গুলি দেখিয়া লইবার সুবিধা পাইতেছিলেন। বিশ্বনাথ ভয় এবং সন্দেহমাত্রশূন্য, সাহেবকে চলিতে অশক্ত দেখিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; দুই এক বার অনুরোধ করিল, এবেলা তাহার অদূরবর্ত্তী কুটীরে বিশ্রাম করিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি না? ফেডি ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদের মাত্রা চড়াইয়া এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইতেছিলেন। সেই বিপজ্জনক তস্করটার বাসগৃহ দেখিয়া লইবার প্রলোভন অতি সহজেই তিনি জয় করিলেন। কেন না, রাত্রে যে দস্যুপতি ততটা ঔদার্য্য দেখাইয়াছিল, তাঁহার মতে সম্ভবত তাহা ঝোঁক এবং জেদের মাথায়। প্রভাতালোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত হিংসাবৃত্তি যে ফিরিয়া আসে নাই, এবং গৃহে পাইলে এখন সহজে ফেডিকে সে ছাড়িবে, কে বলিতে পারে? শপথ করিবার পূর্ব্বে বা পরে কখনই সাহেব আপনাকে তজ্জন্য ধর্ম্মত বাধ্য মনে করেন নাই। তদীয় মার্জ্জিত

ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, সে প্রতিজ্ঞা স্বেচ্ছাকৃত নহে, বলে অপহৃত মাত্র, তাহার কোন "নৈতিক মূল্য" নাই। পক্ষান্তরে বিশ্বনাথ ভাবিয়াছিল, সাহেব হয় ত মেমের জন্য বড় ভাবিতেছে, এবং সেই জন্যই নিজের ক্লেশ গ্রাহ্য করিতেছে না।

উভয়ের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, ভগবানের মধুর কণ্ঠ তখন পঞ্চমে উঠিতেছিল। বিশ্বনাথ সাহেবকে বলিল, "সদর রাস্তা এখান থেকে বেশী দূর নয়, সাহেব, বরাবর তুমি চলে যাও। আর কোন ভয় নেই।" সামুয়েল ফেডি ধন্যবাদ উচ্চারণ করিয়া বিশ্বনাথের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

সেই সঙ্গীতধ্বনির অনুসরণ করিয়া ফেডি সাহেব আড্ডার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু কিছু দূর গিয়া দেখিলেন, নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইবে। অগত্যা তিনি বিশ্বনাথের প্রদর্শিত পথে ফিরিয়া আসিলেন।

সে পথ অপেক্ষাকৃত সুগম, এবং একেবারে মনুষ্যসমাগমচিহ্নবিরহিত নহে। ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইলেন; ইচ্ছা, গ্রাম্যকটা সে পথে আসিলে কৌশলে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। এ দিকে কিন্তু বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করিতেও সাহস হইতেছিল না। দস্যুপতি হয় ত লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিতেছে, এবং সহসা আবির্ভূত হইয়া আবার তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইবে। ফেডি দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না, অথচ গতিবেগ প্রায় সমান রাখিলেন।

ওদিকে প্রত্যুষে নীলকুঠীর ডাকাইতির খবর মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের গোচর হইবামাত্র, অবিলম্বে তিনি সদলে বাহির হইয়া পড়িলেন। মিসেস্ ফেডির মুখে রাত্রির দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ইলিয়ট সাহেব ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং ফেডির উদ্ধারের জন্য দিকে দিকে সওয়ার রওনা

করিলেন ; নিজে চারি জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সিপাহী সঙ্গে স্বরূপগঞ্জের পথে ছুটিয়া চলিলেন।

হোড়ঙ্গের বন হইতে বাহির হইয়া ফেডি সাহেব সরকারী পথের ধারে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। এক কণ্ঠীধারী বাবাজী একটি ব্রাহ্মণতনয় সঙ্গে আসিয়া জুটিল। সাহেব যে পথ চাহিয়াছিলেন, সেই পথে তাহারা দেখা দিল। ফেডিকে দেখিলেই বিষণ্ণ মনে হইতেছিল। তখনকার দিনে সামান্য পান্থবেশে ইংরেজ-দর্শন একটা অভাবনীয় ঘটনা। বিশেষ, সাহেবটির কতকটা দীন মলিন বেশ। রাত্রিজাগরণ এবং দুশ্চিন্তাবশত তাঁর মুখে একটা কালিমা পড়িয়াছিল, বস্ত্রাদিও ধূলি কর্দ্দম কণ্টকে যথেষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ভগবান অগ্রসর হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। ততক্ষণে সামুয়েল ফেডি সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীর্ঘমূর্ত্তি বৈষ্ণবটার আপাদমস্তক দেখিয়া লইতেছিলেন। দেখিয়া গরিব ব্রাহ্মণ বিনোদবিহারী একটু সরিয়া বসিলেন।

ভগবান দয়ার্দ্র হইয়া সাহেবকে প্রশ্ন করিল কোথা হইতে তিনি আসিতেছেন। ফেডি ভাবিতেছিলেন, আপনা হইতে কোন কথা কহিবেন না। কিন্তু ভগবান যদি কথা তুলিল, তবে আর তিনি অনুসন্ধানের এমন একটা সুযোগ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। তাহার প্রশ্নের ঠিক উত্তর না দিয়া তিনি প্রতিপ্রশ্ন করিলেন যে, সে কোথা হইতে আসিতেছে। ভগবান বলিল, সে ভিক্ষুক বৈষ্ণব, ভিক্ষায় গিয়াছিল।

তখন ফেডি সাহেব ভগবানের উপর অজস্র কূটপ্রশ্নবাণ বর্ষণ করিয়া চলিলেন। একটুতে ভগবান বুঝিল, বিশ্বনাথের সংবাদে সাহেবের প্রয়োজন। মনে পড়িল, গত রাত্রিতে বিশ্বনাথের নীলকুঠী লুটিবার কথা ছিল! মদকপুত্র উত্তরে প্রশ্নগুলির গূঢ় অভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে-

ছিলেন। এমন সময়ে সহসা দ্রুতগামী অশ্বপদশব্দে চারি দিক যুগপৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে ঘোড়সওয়ার চারি জন সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট্ ইলিয়ট্ আসিয়া পৌছিলেন। ফেডিকে দেখিয়া তিনি উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেন না, তাঁহাকে জীবিত দেখিবার আশা করেন নাই।

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ইলিয়ট্ ফেডিকে একটু একান্তে লইয়া গেলেন। ততক্ষণে বিনোদ ভগবানকে ইঙ্গিতে বলিতেছিলেন, "চল, আমরা প্রস্থান করি। এ হাঙ্গামায় আমরা থাকি কেন? ভগবান কিছু বলিল না।

সাহেব দুই জনের পরামর্শ কি হইল, তাহা খুলিয়া বলার স্থান এ নহে। ফেডি সদর্পে ভগবানের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, "তুম লোক ভি ডাকু হায়!" ভগবান মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে অভিবাদন করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া দিল। স্বরূপগঞ্জের সেদিনকার পরিচয় ইলিয়টের মনে ছিল। তিনি বলিলেন, "ফেডি সাহেব জঙ্গলে, বিশেষ ডাকাতের আড্ডায়, তোমায় গান করতে শুনেচেন। তুমি নিজে ডাকাত না হতে পার; কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে তোমার জানা শুনা আছে সন্দেহ নাই। তোমায় ছাড়িতে পারি না।" ভগবান করযোড়ে বলিল, "আমার জন্যে ভাবি না, কিন্তু আমার সঙ্গীটিকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হউক। উনি কোনও দোষে দোষী নন।" স্বয়ং বিনোদ কেবল অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, সাহেব দেখিয়া তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। ইলিয়ট্ কহিলেন, "বিচারে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়, তখন দেখা যাবে।"

তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞায় ভগবান ও বিনোদ বন্দী হইয়া কৃষ্ণনগরে চলিলেন। ভগবান গাইতে গাইতে গেল, "সুখের দিনে তোমারে ডাকি পরাণ মন ভরে না!"

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মেঘার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। ফেডি সাহেব স্বকৃত শপথের কোনও মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন না। জাতক্রোধ হইয়া বরঞ্চ তিনি দস্যুদের উপর প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মিসেস্ ফেডিকে কলিকাতায় রাখিতে গিয়া সস্ত্রীক তিনি লাটসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইলিয়ট তৎপূর্ব্বেই কোম্পানির গভর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দস্যুদমন জন্য সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারী একজন এবং কিছু ফৌজ নদীয়ায় পাঠান হউক। সামুয়েল ফেডির মনিব সরকার আফিস হইতেও রাজপ্রতিনিধিসভায় আবেদন গেল যে, তাঁহাদের ধন এবং কার্য্যকারকদের প্রাণ এরূপ আপদসঙ্কুল হইলে, দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান একটা সাধন যে নীলের আবাদ, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বিরত হইতে হয়। ইঁহার ফলে কলিকাতার তখনকার একজন মাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার সি, ব্লাকুয়ার * নদীয়ার জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে জন কতক ইউরোপীয় "সেলার" ও কিছু সৈন্য প্রেরিত হইল।

শান্তিপুরের উপরগস্তিদলে মিশিয়া পাঁচকড়ি সর্দ্দার এ সকল শুনিতে পাইল। তাহার মনিব আসাননগরের নীলকুঠির সাহেব সামুয়েল ফেডির একজন বন্ধু। সব ঠিক্ ঠাক্ করিয়া সর্দ্দার মনিবের দ্বারা ফেডিকে জানাইল, একটু বেশী বেতনে উপরগস্তিদের রাখিতে পারিলে, বিশ্বনাথ

* Mr. C. Blacquire. হণ্টার সাহেব বলেন, এ দেশে ইনিই প্রথম জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্।

অতি সহজে ধরা পড়িবে। ফেডি সাহেব উপরগস্তিদের ডাকাইয়া আনাইয়া কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন, বিশ্বনাথের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য বাস্তবিক তাহাদের মত স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকের দরকার। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পাঁচকড়ি সর্দ্দার আবার কর্ত্তৃপক্ষীয়ের বিশ্বাসভাজন হইয়া চিরপোষিত প্রতিশোধপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত হইল। তাহার প্রার্থনায় বৈদ্যনাথকে কারামুক্ত করিয়া উপরগস্তিদের সহায়তায় নিযুক্ত করা হইল। কেন না, তাহার ন্যায় দস্যুপতির ভিতর-বাহিরের খবর আর কেহ জানিত না।

উপরগস্তিদল অতঃপর কোম্পানির বেতনভোগী হইল বটে, কিন্তু সাধারণে সে কথা জানিল না। পূর্ব্ববৎ তাহারা শান্তিপুর অঞ্চলে থাকিয়া অতিগোপনে বিশ্বনাথ ও তাহার দলবলের গতিবিধির অনুসন্ধান করিতেছিল। স্বয়ং বিশ্বনাথ গা-ঢাকা দিয়াছিল, মাতৃ-আজ্ঞায় ডাকাইতি হইতে একেবারে বিরত হইয়াছিল, এ সকলের কোন খবর সে পাইল না। নিতান্ত অন্তরঙ্গ অতি অল্পসংখ্যক সঙ্গী ছাড়া আর কেহ তাহার অজ্ঞাতবাসের সংবাদ জানিত না। এ দিকে তাহার দলের অন্য ডাকাইতেরা বেশ একটা দাঁও পাইয়া গেল। তাহারা নিজেদের ভিতর দল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে ডাকাইতি করিতে লাগিল। উপরগস্তি দলের ভিতর একজন একদিন খবর আনিল, বিশ্বনাথের দল পরদিন কৃষ্ণনগর হইতে কিছু দূরে পল্লীগ্রামে ডাকাইতি করিবে। ব্লাকুয়ার সাহেব পরদিন সন্ধ্যার পর নিজের দলবল ও উপরগস্তিদল সঙ্গে যথাস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। গভীর রাত্রে সত্য সত্যই ডাকাইত পড়িল। অধিকাংশ ডাকাইত গৃহস্থের উচ্চ ইষ্টকরচিত প্রাচীরবেষ্টিত গৃহে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন সুরু করিয়াছে, এ দিকে ঘাঁটিতে কালীর পাইকরা উন্মুক্ত অসিহস্তে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। এমন সময় "জইণ্ট" সাহেব সহসা বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলিলেন। তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। ব্লাকুয়ার সিপাহীদিগকে আদেশ করিলেন,

দলের সর্দ্দারগুলাকে জীবিতমানে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু কিছুতে তাহারা ইহা পারিয়া উঠিল না। শেষে সিপাহীরা গুলি চালাইবার হুকুম প্রার্থনা করিল। ব্লাকুয়ার তখন "সেলার"দের উপর ডাকাত ধরিবার ভার দিলেন। হণ্টার সাহেব বলেন, ইহারা দীর্ঘযষ্টি সহায়ে ডাকাইতদের হাত হইতে তরবারি বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। এই রাত্রে অনেক ডাকাইত ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু বিশ্বনাথ বা তাহার প্রধান সহচরদের কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। যাহা হউক, জইণ্ট সাহেবের এই উদ্যমে দলগুলি ছত্রভঙ্গ হইল; নদীয়া জেলায় ডাকাইতি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু বিশ্বনাথ ধরা না পড়িলে দস্যুদল নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ফেডি সাহেব তাহার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়াছিলেন। উপরগস্তিরা তাঁহার কাছে বিস্তর টাকা খাইয়াছিল। বিশ্বনাথের অজ্ঞাতবাসের অনুসন্ধানে দিবারাত্রি তাহারা নিযুক্ত রহিল।

অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ভগবান মদক স্বরূপগঞ্জে অল্প দিন ছিল বটে, কিন্তু ইহারই ভিতর সে অঞ্চলে তাহার বিস্তর আত্মীয় বন্ধু জুটিয়াছিল। এই লোকপ্রিয়তার কারণ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাহার সরল অমায়িক ব্যবহার। বিশ্বনাথের মত তাহার অর্থবল ছিল না, দীন দুঃখীকে নিয়ত অন্ন বস্ত্র দিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু প্রাণ দিয়াও পরোপকার করিবার আন্তরিকতা ছিল। অতএব জেলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব পথে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন শুনিয়া, লোকের আপশোষের সীমা রহিল না।

মীরা ও সরলা প্রথম দুই দিন ইহার কিছুই জানিল না। সহসা পীতাম্বরের কাছে শুনিয়া উভয়ে বজ্রাহত হইল। দিদিকে পীতাম্বর গোপনে বলিল, ভগবানের সঙ্গে বিনোদবিহারীও গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া

শোকে মীরা ম্রিয়মাণ হইল। প্রথমত সরলাকে কিছু না বলিয়া ভ্রাতাকে সঠিক সংবাদ লইবার জন্য কৃষ্ণনগর পাঠাইল। পীতাম্বর অনুসন্ধানে জানিয়া আসিল, ডাকাইত দলের লোকগুলাকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ফাঁসি দেওয়াই কর্তৃপক্ষীয়দের অভিপ্রেত। দিগ্‌নগর অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোক ভগবানকে সাধু ভক্ত বলিয়া জানেন, তাঁহারা তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও পীতাম্বর শুনিয়া আসিয়াছিল। বিনোদকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। এক জন ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইবে শুনিয়া লোকে বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে যে, নির্দ্দোষী, তার কোনও প্রমাণ নাই। মোক্তার মহাশয়েরা পীতাম্বরকে টাকার মায়া না করিয়া মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন।

এ সর্ব্বনেশে খবর সরলাকে বলাই মীরা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিল। পীতাম্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ভ্রাতাকে আহারাদি করাইয়া যথাসময়ে মীরা সরলার সঙ্গে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।

কথাটা এত কঠিন যে, চিত্ত স্থির করিয়াও মীরা সহসা দুঃখিনী বালিকাকে কিছু বলিতে পারিল না। তাহার অসামান্য মুখশ্রীতে, কথা কহিবার ভঙ্গীতে, এমন একটা কারুণ্য জড়িত ছিল, সাংসারিকতা এবং কঠোরতা যাহার প্রতি নির্ম্মম দৃষ্টিপাত করিতে সঙ্কুচিত হইত। অন্যান্য দিনের মত মীরা রাত্রে কিছু "জল" খাইল না দেখিয়া সরলা ভারি ব্যস্ত হইল—এতক্ষণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে, দিদি বড় অন্যমনস্ক। অতএব দিদির বিছানায় বসিয়া আদর করিয়া সরলা তাহার চুলের গোছ লইয়া পড়িল। অতি কোমল কণ্ঠে আগ্রহাতিশয়ে সরলা থাকিয়া থাকিয়া মীরাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"আমার মাথা খাও, কি হয়েছে বল না দিদি?"

তখন প্রথমত একটি একটি করিয়া মীরা ভগবান সম্বন্ধে ভাইয়ের

কাছে যাহা শুনিয়াছে, সরলাকে সকলই বলিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সরলা তাহার প্রত্যেক কথা তন্ময়চিত্তে শুনিতেছিল। ভাবিতেছিল, সে কি দুর্ভাগিনী, যে কেহ তাহার হিতাকাঙ্ক্ষা করে, জগদীশ্বর তাহাকেই বিপদ্‌গ্রস্ত করেন। এমন সময়ে মীরা প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে বিনোদবিহারীর কথাও বলিল।

শুনিয়া সরলা দিদির মাথা হইতে হাত তুলিয়া হইল। তার পর চক্ষু বুজিল। মীরা ফিরিয়া বসিয়া তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি অতি যত্নে আপনার কোলে তুলিয়া লইল। তাহার ফোটা ফোটা চোখের জলে সরলার কপোল ভাসিয়া যাইতেছিল।

একোনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

বড় যন্ত্রণায়, প্রায় অনিদ্রায়, দুই জনের সে রাত্রি কাটিতেছিল। সরলা নীরবে মাতাকে মনে করিয়া কেবল অশ্রুমোচন করিতেছিল; মীরা নানা কথায় প্রবোধ দিয়া বলিতেছিল—"ভয় কি, বিনোদ কোন দোষে দোষী নন, কোম্পানি অবিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড করবেন, এমনও কি হয়?" আবার কখন বা সরলার পুণ্যজ্যোতিঃপূর্ণ, অনিন্দিত আননশোভা দেখিতে দেখিতে আপন মনে কখনও বা অস্ফুটস্বরে বলিতেছিল, "সতীলক্ষ্মীর তিনি অপমান করেছিলেন, বিধাতার মনে কি আছে, কে জানে?" শুনিয়া সরলা একবার বাষ্পগদগদ স্বরে বলিল, "দিদি, সে জন্যে কখ্‌খন ত আমি তাঁর মন্দ কামনা করি নি! রোজ ভেবেচি, দুঃখিনী আমি, আমার অদৃষ্টই এই। তিনি সুখে থাকুন!" মীরা তাহাতে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "সতী সাধ্বী তুমি বোন্, তোমার পুণ্যে স্বামী তোমার নিরাপদ হবেন। ভয় কি?"

শেষরাত্রে ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বর মীরাকে ডাকিল,—"দিদি, একবার দুয়ার খোল!" নূতন কোনও বিপদ আশঙ্কা করিয়া মীরা দ্বারের অর্গল মুক্ত করিল। ভাই বলিল, "বিশ্বনাথ এসেচেন দিদি, তোমাদের একবার প্রণাম করে যাবেন। বল ত অন্দরে তাঁকে আনি। বাইরে কথাবার্ত্তা কওয়া নিরাপদ নয়।" মীরা সরলাকে লইয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া বসিল, পীতাম্বর বিশ্বনাথকে লইয়া আসিল।

বিশ্বনাথ চিরবিদায় লইতে আসিয়াছিল। বলিল, "এ জীবনে মা তোমাদের চরণ আর দেখ্‌তে পাব, সে ভরসা ছিল না; এই শেষ। এও ঘটত না, কেবল ব্রহ্মহত্যানিবারণের জন্যে, প্রাণের যারা বন্ধু, আজও যারা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফিরছে, তাদের কথা অগ্রাহ্যি করে এসেচি!" তখন বিশ্বনাথ বিনোদবিহারীর কথা তুলিল। ভগবানের কথা কহিতে গিয়া বালকের মত অধীর হইয়া বলিল, "সে বাঁচ্‌তে পারত, কিন্তু মিছে কথা বলে প্রাণ বাঁচাবার লোক সে নয়। কিন্তু এ আমার জানা আছে, সাহেবেরা দগ্ধে দগ্ধে মার্‌লেও ভগবান আমার অনিষ্টের একটি কথাও বল্‌বে না। তার সাক্ষীতে ঠাকুরের ভাল হতে পারত, কিন্তু তা কি কোম্পানি মান্‌বে?"

তখন বিশ্বনাথ বিনোদের জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া দিল। বলিল, "আমার বিশ্বাস, মাঠাকুরাণীরা নিজে মাজিষ্টার সাহেবকে বল্‌লে ঠাকুর নিশ্চয় বাঁচবেন। সাহেব জাত, ভদ্দর বংশের মেয়ে ছেলের কথায় অবিশ্বাস করবে না।" পীতাম্বর ইহাতে আপত্তি করিল। "দিদি যদি হলফ নিয়ে মাজিষ্টর সাহেবের এজলাসে সাক্ষী দিতে যান, তবে মান ইজ্জত কি রইল? প্রাণ থাকৃতে আমি তা করতে দেব না।" বিশ্বনাথ পীতাম্বরের নিতান্ত কাছে বসিয়াছিল, তাহার পিঠে হাত দিয়া ঈষৎ হাসিল। "ভাই, তোমার মান ইজ্জতের হানি হতে পারে, এমন শলা আমি দিতে আসি নি। মাঠাকুরাণীরা সাক্ষী দিতে যাবেন, এ তো হতেই পারে না। কিন্তু

তুমি কি শোন নি, পূজোর সময় সাহেব যখন এসেছিলো, মাঠাকুরাণীদের বলে যায়, বিপদের সময় মনে কর্তে। আমি বলি কি, তুমি নিজে একবার কৃষ্ণনগর গিয়ে মাঠাকুরাণীদের তরফে সাহেবকে নিমন্ত্রণ করে এসো। বরঞ্চ একখানা চিঠিও লিখে নিয়ে যাও। এঁরা কি লিখতে পড়তে জানেন না?"

মীরা ও সরলা, উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিল। পীতাম্বর বলিল, "দিদি একটু একটু হিন্দী জানেন, বাবা শিখিয়েছিলেন। দিদির মুখে রামায়ণ পড়া শুন্‌তে তিনি বড় ভাল বাসতেন!" মীরা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বিশ্বনাথ বলিল, "তবে বেশ হয়েচে। দিদির দস্তখত করা চিঠি নিয়ে ভাই কালই তুমি সাহেবের কাছে চাল যাও। চিঠি হাতে দেবার সময় মুখে মুখে তাঁকে তাঁর শেষ কথাটা মনে করে দিও। সাহেব জাত, প্রতিজ্ঞা ভুল্‌বে না। নিশ্চয় দেখো, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আস্‌বে।"

পীতাম্বর মোক্তারদের পরামর্শ বিশ্বনাথকে বলিল। বিশ্বনাথ ঘৃণায় ভ্রু কুঞ্চিত করিল। "ছি ছি! ও দিক দিয়ে যেও না। ইংরেজ যদি মিছে বুঝতে পারে, হিতে বিপরীত হবে।" পীতাম্বর পুনশ্চ বলিল, "শুন্‌তে পাই, নীলকুঠীর ফেডি সাহেবকে ছেড়ে দিয়েই তোমার এত বিপদ। কৃষ্ণনগরে রাষ্ট্র যে, সে বাইবেল হাতে দিব্বি করেছিল, তোমার কোন অনিষ্ট করবে না। মাজিষ্টর সাহেবও ত সেই সাহেব, তাকেই বা কি বিশ্বাস! শেষে আমরা শুদ্ধ বিপদে পড়বো না ত?" বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল। ক্ষীণ ঈষৎ হাসি, কিন্তু তখনও তাহা আশার উৎসাহে সরস। "ভাই! ভাল মন্দ লোক সব জেতেই আছে। আজ ইংরেজ আমার ভয়ানক শত্রু বলে কি আমি তাদের অশেষ গুণ ভুলে যাব! আমি চল্‌লাম, আমার শেষ অনুরোধ ভুলো না—নিশ্চয়ই ঠাকুর রক্ষা পাবেন।"

তার পর বিশ্বনাথ ভক্তিভরে মাঠাকুরাণীদের প্রনাম করিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথ যেমন অলক্ষ্যে আসিয়াছিল, তেমন অলক্ষ্যে ফিরিতে পারিল না। উপরগস্তিরা নিশিদিন ছদ্মবেশে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; ডাকাইতির প্রধান সম্বল যে দ্রুতযান রণ্‌পা, তাহাও তাহাদের অবিদিত ছিল না। বিশ্বনাথ আসিবার সময় বাঁকা পথে আসিয়াছিল, ফিরিবার সময় অপেক্ষাকৃত সোজা পথে গেল। আর কেহ হয় ত এটি করিত না, কিন্তু বিপদজাল বেষ্টিত হইলেও- এক মুহূর্ত্তের জন্য সাহস এবং পৌরুষ তাহাকে ত্যাগ করে নাই। নিজের গন্তব্য স্থান যখন দুই ক্রোশমাত্র ব্যবধান, নিশা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন বিশ্বনাথের বিদ্যুৎগতি বৃক্ষমূলে আসীন এক জন উপরগস্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অবিলম্বে সে তাহার অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। তাহা হইলেও চর এই ঘটনায় বুঝিয়া লইল, বিশ্বনাথের অজ্ঞাত বাসগৃহ দূরবর্ত্তী নহে। এইরূপে বিশ্বনাথ নিজের শেষ দিন কতকটা স্বেচ্ছায় সংক্ষেপ করিয়া আনিল।

বিশ্বনাথকে ধরাইয়া দিলে পুরস্কার মিলিবে, উপরগস্তিটা সুতরাং কাহারও কাছে কিছু ভাঙ্গিল না। পর দিন সোজা পথে অগ্রসর হইয়া সে কুলিয়ার মাঠের চারি দিকে ঘুরিল। দেখিল, প্রকাণ্ড মাঠ, আশে পাশে ধান্যক্ষেত্র আছে বটে, কিন্তু মাঝের অনেকখানি স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুল্মে পরিপূর্ণ। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে দুই দিন বেড়াইয়া দেখিল, অন্য দিকে দুই চারি ক্রোশের ভিতর লুকাইয়া থাকিবার মত বন জঙ্গল

কিছু নাই। অতএব তাহার নিশ্চিত ধারণা হইল, অন্তত বিশ্বনাথ বা তাহার দলের কেহ সে রাত্রে কুলিয়ার মাঠে আশ্রয় লইয়াছিল।

এই সূত্র ধরিয়া চর নানা বেশে এবং নানা প্রয়োজনের ছলনায়, দিনের পর দিন কুলিয়ার মাঠ প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। মধ্যবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণ্টকবনে একাকী প্রবেশ করিয়া নিঃসন্দেহ হইতে সাহস হইতেছিল না, অথচ গোল করিলে পুরস্কারের অর্থে ভাগ বসিবে। এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া লোকটা কুলিয়া গ্রামের দু একটা দুষ্টগোছের রাখালকে কিছু পয়সা কবুল করিল। তখন বনকুলের সময়, মাঝ বনের ভিতর হইতে যদি কিছু কুল তাহারা আনিতে পারে। রাখালেরা একবাক্যে সে জায়গায় যাইতে অস্বীকার করিল। একজন বলিল, না জানিয়া ইহার ভিতর সে একদিন বনের ধারে দুপুর বেলায় গাই চরাইতে গিয়াছিল। কোথা হইতে একরাশ ঢিল আসিয়া তাহার পিঠে পড়িল। আর সে বনের মাথার উপর স্পষ্ট ধূম্রেখাও দেখিতে পাইয়াছিল।

উপরগস্তি অতঃপর সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিল। নিজে যাহা দেখিয়াছিল, এবং যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল, ব্লাকুয়ার সাহেবের প্রশ্নমতে তাহা বিবৃত করিল। কৃতনিশ্চয় না হইলেও, সাহেবেরা সদলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সহসা এক দিন অগ্রহায়ণ মাসে ধান্যকর্ত্তনরত কৃষকদিগকে বিস্মিত করিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্লাকুয়ার ও ফেডি সঙ্গে শীকারে চলিলেন।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ইলিয়ট্ সাহেব মীরা সরলাকে বিস্মৃত হন নাই। ভগবানকে বন্দী করিয়া কৃষ্ণনগরাভিমুখে ফিরিবার সময় বারম্বার তাহাদের কথা তাঁহার মনে হইতেছিল। তেমন সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাদের রক্ষক এবং অভিভাবক এই

ভগবান মদক—এ লোকটা কি তবে সত্য সত্যই দস্যুদলে সংস্পৃষ্ট ? বিশেষত তাহার সহচরটি ব্রাহ্মণ, উপবীতধারী, ক্ষীণজীবি, ভিক্ষুকবেশী,— এ লোকটাও তবে বিশ্বনাথের দলভুক্ত ? ঘোর সন্দেহে ইলিয়ট সাহেবের চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি ফেডিকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতেছিলেন। ফেডি হেলিবার পাত্র নহেন। তাঁহার সেই একই উত্তর—বিশ্বনাথের আড্ডায় ইহাদিগকেই তিনি গান করিতে শুনিয়াছিলেন।

ভগবান এবং বিনোদ হাজতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইলিয়ট্ সাহেবের ব্যবস্থায় তাঁহারা অন্যান্য ডাকাইত আসামীদের দল হইতে পৃথক রহিলেন, এবং তাহাদের মত হস্তপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন না। দিগ্‌নগর অঞ্চলের ভদ্রলোকেরা ভগবানের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন শুনিয়াও, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইল। অতএব মীরা যে রাত্রে সরলাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছিল, সেই রাত্রে, প্রায় একই সময়ে, ইলিয়ট্ অকস্মাৎ হাজতগৃহ পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন।

সাহেব ভগবানের কাছে গেলেন। বিনোদ প্রহরীদিগকে সসম্ভ্রমে কারাগারের দ্বার অর্গলমুক্ত করিতে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। ভগবান ঝুলিহস্তে হরিনাম করিতেছিল, বাহিরের কিছুতে তাহার মন ছিল না; সাহেব গৃহে প্রবেশ করিলেও তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল না। জমাদার সরফরাজি দেখাইবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে যাইতেছিল, সাহেবের কাছে ধমক খাইয়া হটিয়া গেল। প্রহরীরা কেহ সেখানে থাকিতে পাইল না।

সাহেব বিনোদের কাছে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি যদি সব সত্য বল, তোমার পক্ষে ভাল হইতে পারে।" বিনোদ করযোড়ে উত্তর করিলেন যে, ডাকাতির ভাল মন্দ কিছুই তিনি জানেন না, এবং

তখন সেই পারঘাটায় বিশ্বনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ অবধি হোড়ঙ্গের বনপ্রান্তে গ্রেফতারি পর্য্যন্ত, প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা অকপটে বিন্দুমাত্র অপলাপ না করিয়া বলিয়া গেলেন। ঈশ্বর সাক্ষী শপথ করিয়া দুই হস্তে উপবীত জড়াইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিনোদবিহারী ইলিয়ট সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্মুখে আপনার ভালমন্দ কাহিনী শেষ করিলেন। তাহাতে সাহেব অবিশ্বাসের বিশেষ কারণ দেখিতেছিলেন না। জপ সাঙ্গ করিয়া ভগবানও এই সময়ে সাহেবকে সেলাম করিল।

সাহেবের প্রশ্নমতে ভগবান নিজের অনেক কথা বলিল বটে, কিন্তু বিশ্বনাথের অনিষ্ট হইতে পারে, এমন কথা একটিও বলিল না। ইলিয়ট জেদ করিলে বলিল,—"গলা কেটে দিলেও সাহেব, আমা হতে তা হবে না। যার নুন খেয়েছি, আমরণ তার গুণই গাব।" বিশ্বনাথের উপস্থিত বাসস্থানের কথা সুধাইলে ভগবান বলিল,—"সত্য সত্য তার কিছুই জানি নে। ইচ্ছা করলে জান্‌তে পারতাম, কিন্তু মিছে বল্‌তে হবে, এই ভয়ে ইচ্ছে করেই জানিনে। জান্‌লেও বল্‌তাম না সাহেব।"

ভগবান বিনোদকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী জানাইয়া প্রার্থনা করিল, তদ্দণ্ডে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হোক্। সাহেবের দয়া উদ্রিক্ত করিবার আশায় এই প্রথম ভগবান তাহাকে সরলার স্বামী বলিয়া পরিচিত করিল। ইলিয়ট্ হাজতগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু সে রাত্রে তাঁর ভাল নিদ্রা হইল না; অতি প্রত্যূষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি একাকী অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * *

এ দিকে শেষ নিশায় বিশ্বনাথকে বিদায় দিয়া মীরা এবং সরলা স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিল বটে, কিন্তু সেই চারি দণ্ড চারি যুগ বলিয়া তাহাদের মনে হইতেছিল। স্বামীকে বাঁচাইবার ভরসায় সরলা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত

হইলেও, পীতাম্বরের আপত্তির কথা হৃদয়ে তাহার কেমন একটা খট্‌কার সঞ্চার করিয়াছিল। স্বামীর প্রাণরক্ষা নিশ্চিত না হউক, চিঠি দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডাকিয়া আনিলে হিতে বিপরীত ঘটা অনেকটা নিশ্চিত। কেন সে আপনার স্বার্থের জন্য মীরাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দিবে? যে পিতৃতুল্য বিক্রম সিংহ হতভাগিনীকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে গিয়াই অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, জানিয়া শুনিয়া সরলা কি তাঁহার অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে দিবে? না, পীতাম্বরের চিঠি লইয়া গিয়া কাজ নাই। মীরা বা পীতাম্বরের ইহাতে আর আদৌ লিপ্ত থাকারই দরকার নাই। বদন এবং আয়ি বুড়ী সম্প্রতি সরলাকে দেখিতে আসিয়াছিল সরলা চিত্ত স্থির করিল যে, তাহাদের দু জনকে সঙ্গে করিয়া দুঃখিনীর বেশে সে মাজিষ্টর সাহেবের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করিবে। প্রার্থনা গ্রাহ্য না হয়, চিরজীবনের তরে স্বামীকে একবার প্রণাম করিয়া আসিবে! একবার করযোড়ে তাঁহাকে বলিয়া আসিবে, প্রত্যাখ্যাননিশিতে বালিকার সে প্রগল্‌ভতা তিনি মার্জ্জনা করুন! মীরা বলিয়াছিল, "সতীলক্ষ্মীর তিনি অপমান করেছিলেন, বিধাতার মনে কি আছে, কে জানে?" শুনিয়া অবধি সে কথা সরলার প্রাণে বাজিতেছিল। চিরদুঃখিনী সরলা ভাবিতেছিল, স্বামীর হাত ধরিয়া বলিয়া আসিবে যে, সে কখনও তাঁর মন্দ কামনা করে নাই।

* * * *

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইলিয়ট্ সাহেব স্বরূপগঞ্জে আসিলেন। বিশ্বনাথের সে আড্ডাগৃহ জনমানবশূন্য, কয় দিনের ভিতর পড়ো বাড়ীর মত দেখাইতেছিল। বিষণ্নমনে সাহেব গ্রামাভিমুখে চলিলেন। পীতাম্বর শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির অনুরোধে নদীর দিকে যাইতেছিল। মাজিষ্ট্রেটকে চিনিত, দেখিয়া বিপদাশঙ্কায় প্রমাদ গণিল। সাহেব ভদ্রলোক দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলিতে পারেন,

যে দুইটি ভদ্রমহিলা এবার এখানে পূজা করিয়াছিলেন, তাঁরা এখানে এখন আছেন কি না?"

পীতাম্বর সাহেবকে সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিল। সেখানে মীরা এবং সরলার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইল, আমরা তাহা সবিস্তারে বলিব না। ইলিয়ট ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের কাছে বিশ্বনাথের প্রসঙ্গ করিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন—এবার তাহার দিক দিয়াও গেলেন না। ভগবান এবং বিনোদের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল—মীরা এবং সরলার বাক্যে সন্দেহমাত্র রহিল না। সরলা প্রাণের দায়ে এবার লজ্জা ত্যাগ করিল। এবারে আর দিদির উপর নির্ভর করিল না;—কেন না, মীরাকে তাহার বিপদে সংস্পর্শশূন্য রাখাই বালিকার অভিপ্রেত।

মীরা আপনা হইতে বিনোদের কথা তুলিল। না তুলিলে সরলা স্বামীর জন্য কিছু বলিতে পারিত কি না সন্দেহ। যুক্তকরে সরলা কেবল নতমুখে অশ্রুমোচন করিতেছিল। সাধ্বীর সেই নির্ব্বাক প্রার্থনায় নিষ্ঠুর স্বামীর প্রত্যাখ্যানবার্ত্তা ইলিয়টের হৃদয় মথিত করিতেছিল। সেই কথা শুনিয়াই গত রাত্রে তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। সাহেব রুমালে চক্ষু মুছিলেন। উভয়কে অভিবাদন করিয়া অভয় দিয়া গেলেন।

দ্বিষষ্টিম পরিচ্ছেদ।

নদীয়া জেলার সুবিস্তৃত মাঠের অভাব নাই, এবং বন জঙ্গলও যথেষ্ট। বিশ্বনাথ পুরাতন আড্ডাগুলি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গলে যে বাসগৃহ ইদানীং নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মেঘা প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সহচরদের মতে তাহাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। দস্যুদলের অনেকে পূজার সময় সে স্থান দেখিয়া আসিয়াছিল; দলপতির দুর্দ্দিনে, তাহার অজ্ঞাতবাসের অবসরে, সকলেই যে অর্থলোভ সম্বরণ করিবে, কে বলিতে পারে? অন্যান্য স্থানের চেয়ে

কুলিয়ার মাঠের আকর্ষণ এই যে, ইহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন জঙ্গল অধিকাংশ স্থলে কণ্টকবৃক্ষখচিত, শত্রু আসিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকিবে, অথবা সহসা আক্রমণ করিবে, সে সম্ভাবনা ছিল না! এই বনের মধ্যস্থানে মাটির নীচে বাসস্থান উঠাইয়া বিশ্বনাথ নীলকুঠী লুটের পর হইতে লুক্কায়িত ছিল। সঙ্গী সবে পাঁচ ছয় জন মাত্র। ছায়ার মত তাহারা দলপতির সঙ্গে মিশিয়াছিল। মেঘা ইহার ভিতর এক জন। আত্মরক্ষায় বিশ্বনাথের চিরদিনই ঔদাসীন্য—মেঘার কথাই সে একটু শুনিত। সে দিন স্বরূপগঞ্জে যাওয়ার আগে মেঘার সঙ্গে তাহার খুব বচসা হইয়াছিল।

চর সাহেবদিগকে এই কুলিয়ার মাঠের অদূরে আনিয়া উপস্থিত করিল। দূরবীণযোগে দূর হইতে বন লক্ষ্য করিতে করিতে ব্লাকুয়ার ইলিয়টকে বলিলেন, “শীকারের খবর বুঝি মিছা হয়!” তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সামুয়েল ফেডি চরটাকে “শূয়ারকি বাচ্চা” প্রভৃতি মধুর নামে অভিহিত করিলেন। চর একাকী পুরস্কার ভোগ করিবার দুরাশা করিয়া দলের লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিল, অতএব সাহেবের এই গালির পর তাহাদের তরফ হইতে একচোট বিদ্রূপবাণও সহ্য করিল। তখন সে “মরিয়া” হইয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিল। তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ব্লাকুয়ার ইতিপূর্ব্বেই বাঁকা পথে মাঠের চারি দিকে সিপাহী রওনা করিয়াছিলেন। চর বনের ভিতর গেল দেখিয়া, তিনি উপরগস্তিদের প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। সেলারদের সঙ্গে সশস্ত্র হইয়া সাহেব তিন জন ধান্যক্ষেত্রে লুকায়িত হইলেন। অনুষ্ঠানের কিছুই আর বাকী রহিল না।

ও দিকে চর অতি সন্তর্পণে ঝোপের অন্তরালে অন্তরালে গুড়ি মারিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত অলক্ষে অগ্রসর হইল। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে সপ্তপর্ণবৃক্ষচ্ছায়ার নীচে, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বিশ্বনাথ তখন সদলে

আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে। দেখিয়া অণুমাত্র দেরি না করিয়া সে পূর্ব্ববৎ সাবধানে ফিরিয়া আসিল।

শুইয়া বসিয়া নিঃশব্দে যাতায়াত করিতে চরটার অনেক সময় লাগিয়াছিল। ততক্ষণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সিপাহী এবং উপঁরগস্তিরা বনের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। সাহেবেরাও অসহিষ্ণু হইয়া ধান্যক্ষেত্রের অন্তরাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব চর ফিরিয়া সংবাদ দিবামাত্র বেগে তাঁহারা সেই কণ্টকবনে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বনাথের অস্ত্রশস্ত্র মাটীর নীচে ক্ষুদ্র অস্ত্রাগারে রক্ষিত ছিল—আহারের স্থানে থানকতক লাঠি ছাড়া আর কিছু ছিল না। কেবল মুসলমান মেঘা পার্শ্বে তরবারি রাখিয়া অদূরে একাকী ভোজনে বসিতেছিল। বিপদ বুঝিতে পারিয়া সে বিশ্বনাথকে আপন অসি সমর্পণ করিতে গেল। বলিল, "বিশু" শেষ দিন একবার তরওয়াল ধর্। তোর মুখ চেয়ে ছয় জন আমরা এখনও ছয় শ'।" দলপতি তাহা গ্রহণ করিল না। স্থিরকণ্ঠে বলিল, "আর বাঁচার চেষ্টা বৃথা! মা কালী অপ্রসন্ন না হলে আজ ইঁদুরের মত কলে পড়্তাম না। স্বপ্নে ক'দিন তাঁর ভ্রুকুটিই দেখ্‌চি! তোদের যা ইচ্ছে হয় কর, আমি বাঁচাবার জন্য একটি আঙ্গুলও তুলব না।" মেঘা গর্জ্জিয়া উঠিল। "চিরদিন তোকে মাথার মণি ভেবেচি, আজ আর কি বল্‌ব বল্। নিজের দোষে মর্‌লি। নিজে লাঠি তরওয়াল না ধরিস্, আমায় একবার হুকুম দে বিশু!" বিশ্বনাথ সমাগত সাহেবদের ভিতর ফেডি সাহেবকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল,—মেঘার কথার উত্তর দিল না। হতাশ্বাস হইয়া মেঘা বলিল, "তবে তুই ধরা দিবি দে, আমি কিন্তু কাফেরের হাতে মরব না।" তখন মেঘা দৃঢ়হস্তে চিরজীবনের সঙ্গী সেই তীক্ষ্ণধার অসিফলক আমূল আপনার বুকে বসাইয়া দিল।

মেঘাকে ফেডি সাহেবের খুব মনে ছিল; স্বহস্তে তাহার মাথাটা শরীরচ্যুত করিতে পারিলে তবে তাঁর রাগ যাইত। বেগে তিনি তাহার

বিমুক্তপ্রাণ ভূপতিত দেহের দিকে ছুটিয়া গেলেন। বিশ্বনাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "হাঁ, ঐ মরা মানুষকে ঘা কতক লাথি মার্‌তে না পার্‌লে তুমি ঠিক হতে পার্‌চ না! মনে পড়ে ফিরিঙ্গি, ওই সেই তরওয়াল খানা? মনে পড়ে সেই কসম, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের যে ঈশ্বর, তিনি সাক্ষী, তুমি আমাদের কোন মন্দ কর্‌বে না? ছি, ছি, সাহেব, ইংরেজ জেতের তুমি মুখ হাসালে?" সামুয়েল ফেডি এই শ্লেষবাক্যে মাটী হইয়া গেলেন, নতমুখে থমকিয়া দাঁড়াইলেন,—আর অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার সেভাব দেখিয়া ইলিয়ট ও ব্লাকুয়ার বিস্মিত হইয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। দেখিয়া নির্ভীক বিশ্বনাথ উচ্চহাস্য করিল। দৃঢ় উচ্চ হাস্য,—ঘৃণা বিদ্রূপ একত্র মিশিয়া তাহার প্রত্যেক তরঙ্গে প্রহত হইতেছিল। বিশ্বনাথ কহিল, "বুঝেছি, নিজের বীরত্বের কথা তোমাদের বল্‌তে ফেডি সাহেবের সাহসে কুলোয় নি। শপথ করে আমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করে আজ আমাদেরই ধরিয়ে দিতে এসেছেন! কেমন ফেডি সাহেব, মিথ্যা বল্‌চি কি? যা হোক্‌, ধর্ম্মটা দেখালে ভাল!"

ফেডি চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বনাথ আবার বলিল, "কি ছার এ প্রাণ ফিরিঙ্গি, বিশে পরশু মর্‌তো, না হয় কাল মর্‌বে! বিশে ডাকাত কিন্তু ডাকাতি করে কথন নিজের পেট পূরোয় নি, কথন তোমার মত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে নি!"

তখন বিশ্বনাথ ইলিয়ট সাহেবের দিকে অগ্রসর হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। বলিল, "আমার আয়ু শেষ হয়েচে। যে কোন শাস্তির জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।"

পরিশিষ্ট ।

তার পর ইংরেজের বিচারে বিশ্বনাথ ও তাহার সহচুরদের ফাঁসি হইয়াছিল। ঠগবগের খালের মাঠে যে বট গাছে ইহা সম্পাদিত হয়, আজও তাহা শ্রান্ত পথিকদের সুশীতল ছায়া দান করিতেছে। হণ্টার সাহেব বলেন, দস্যু-দের মৃতদেহ লোহার পিঞ্জরে পুরিয়া এই গাছে লটকাইয়া দেওয়া হয়; উদ্দেশ্য,—দেখিয়া কুকর্ম্মীদের চৈতন্য হইবে। জনশ্রুতি বলিতেছে, "বিশ্বনাথ ফাঁসির আগে বলে, 'গোয়ালাকে কেউ কখন বিশ্বাস করো না ভাই!' তার মা সাহেবের কাছে ছেলের মৃত্যুর পর হাড়গুলি চাহিয়া-ছিল, কিন্তু পায় নাই। সাহেবেরা বাক্সবন্দী করিয়া সেগুলি স্থানান্তরিত করেন! মা নাকি বলিয়াছিল যে, হাড় পাইলে বিশুকে সে আবার বাঁচাইতে পারিবে।"

বিশ্বনাথের ফাঁসিতে সে কালের জনসাধারণ কিরূপ সন্তপ্ত হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদগীতে তাহার কতকটা বুঝা যায়;—

"ওরে রফি দেখে যা, কি দশা যে হ'ল,
আশা নগরের মাঝে আশা ফুরাইল।"

ইলিয়ট সাহেবের কৃপায় বিনোদবিহারী বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন প্রত্যাখ্যাতা পত্নীকে সযত্নে গৃহে লইয়া গিয়া, শেষজীবন তিনি সুখ শান্তিতে যাপন করেন। সরলার মধুর চরিত্রগুণে তাঁহার তেমন অশান্তির সংসারও অতঃপর সুখের হইয়াছিল। মীরাকে সরলা জীবনে কখন ভুলে নাই। গঙ্গাস্নানোপলক্ষে প্রতি বৎসর তাহার কাছে মাস খানেক কাটাইত।

সম্পূর্ণ।

APPENDIX.

This was the transition state of Nadiya. The summary laws of the Raj for the repression of crime being abolished and the police of the Company's Government being as yet unable to cope with it, the District became the head-quarters of robbers and *dakaits*, who carried on their depredations with impunity. One of them, 'Biswanath Babu' exercised his vocation in broad daylight, sending previous notices of his designs to those whom he intended to plunder, provided his demands were not complied with. Biswanath Babu was a *bagdi* by caste, an inhabitant of Asanagar, ten miles from Krishnagar. His chief companions were Naldaha, Krishna Sardar, and Sanyasi Naldaha, who as his name implied, had the faculty of diving and remaining under water for a long time. The gang numbered more than 500 *dakaits*. On one occasion, when their leader wanted to celebrate puja, he found that his available funds would not suffice; he therefore determined, from information received, on plundering the *gadi* at Kalna, where the Nandis of Baidyapur had just remitted 10,000 rupees in cash. He took a boat at night and came down to Kalna, accompanied by only four companions armed with

swords and pistols. On his arrival he sent for the *daroga* and made him sign a paper purpoting to be an *ikrar* in which the *daroga* confesses to collusion with the *dakaits* in the robbery of the *gadi*. Biswanath and his companions then landed and helped themselves to the treasure. On another occasion Biswanath received intimation of large remittance having arrived from Calcutta at the factory of Mr. Samuel Fady, an indigo-planter of Nadiya. The remittance was sent to enable Mr. Fady to make advances to his rayatas. Biswanath with his gang attacked Mr. Fady's bunglow at night, and loot ed the money. Mrs. Fady, in fear for her life concealed herself in a tank in the compound, have ing put a black earthen pot over her head, with a view to rendering discovery impossible. Mr. Fady was pinioned by the *dakaits*, and carried by them to their rendezvous where a discussion between Biswanath and his companions took place as to the expediency of killing Mr. Fady, The general opinion was in favour of the murder; but Biswanath was opposed to it, and thought that to shed the blood of an Englishman would create a great sensation, and array against them the active hostility of all *Shahiblogon*, While this discussion was going on, one of the ruffians

rushed upon Mr. Fady with a drawn sword, and was about to murder him, when Biswanath caught hold of his arm and snatched the sword from his grasp. It was at last resolved that Mr. Fady should be let off, on his promising not to betray them. Mr, Fady gave the required promise, and was allowed to depart ; but considering the promise extorted from him as not binding on his conscience, he went straight to the house of the magistrate, Mr. Elliot. As the police force at the disposal of the magistrate was insufficient to cope with formidable gang of Biswasnath, he applied to the Government for the aid of a company of sepoys from the militia. The application was complied with ; and Mr, C. Blacquiere, then one of the magistrates of Calcutta, was associated with Mr. Elliot as a joint magistrate ; this being instance of an uncovenanted officer's being the first deputed to the muffasul to take an active part in the executive department. Mr. Blaequiere brought with him a few European sailors and a body of *Upargostis*, who were able-bodied men, and being all natives of Santipur, could watch and report to their chief the movements of Biswanath's gang. From information received from one of the *Upergostis*, he proceeded with his men to a spot where Biswanath intended to commit a gang-robbery

He found the leaders of the gang brandishing their swords outside a house, while it was being plundered inside by their followers. Mr. Blacquiere ordered the sepoys to arrest the leaders alive, bnt they pleaded their inability to do so. They, however, said they would, if permitted, shoot them down. The European sailors were then called upon to capture them. This they did, having first disarmed the *dakaits* of their swords, by hitting their arms with long sticks. The sepoys then surrounded the house, and apprehended the rest of the robbers. This tranquillized the District for a time. The *Upargostis* were indefatigable in tracking out those had had escaped, and at length discovered Biswanath and his chief companions engaged in dressing their food in a jungle. Mr. Elliot, Mr. Blacquiere and Mr. Fady immediately marched with their forces to the spot, and surrounded this wood. The gentlemen rushed in, and arrested Biswanath and his companions. The bandit taunted Mr. Fady for his breach of promise and added he was now prepared of whatever might befall him. Biswanath and a dozen of his accomplices were tried, convicted. and capitally sentenced. They were hung on a scaffold on the riverside. Their corpses were caged and suspended from a *Bat-tree*

(Ficus Indica) for public exhibition, and as a warning to evil-doers.

VIDE PAGE 159—161

Hunter's Statistical Account of Nadiya.

Phuljani. By Baboo Shrish Chandra Mazumdar. Printed by Jajneshvar Ghose, at 12, Ram Krishna Das's Lane. Published by Guru Das Chatterji 201, Cornwalis Street, Calcutta.

Since the death of Babu Bankim Chandra Chatterji, the great novelist of Bengal, we have been watching with great interest the progress of works of fiction in Bengali. The record of the last four months is almost a blank. In the beginning of this month, however, we received a very good work from the pen of Babu Shrish Chandra Mazumdar, whose Shakti Kanan was so favourably received some years ago. As in his old, so in his new work *Phuljani*, the author has attempted with marked success to paint the Bengali character as it was in the eighteenth century. He has given a faithful picture of the Hindus, and has described the influence of Muhammadan civilization, Muhammaden rule and Muhammadan culture on it. He has shown clearly that, though wealthy Hindus formed their courts on the model of those of the Muhammadan Nawabs, the Muhammadans absolutely failed to make any deep impression on the domestic economy and profound religious convictions of the higher class of Hindus. The story of Phuljani, we are afraid, is not a historical one, bnt it is an old, old story. The Burtala people have been selling for the last fifty years a wretched metrical composition of that name, and the story is that of the abduction of a beautiful Hindu girl for the Zenana of a Muhammadan grandee. It is on basis of that story that Babu Shrish Chandra has created a whole host of characters, high and low, Hindu and Muhammadan, master and servant, teacher and pupil, zamindar and tenant. The characters are distinctly drawn, and some of them, namely, the Naib Mahasaya, his son Purander, and Phuljani, are, we believe, in high relief. As a shrewed observer of human nature—the chief characteristic of a rising novelist—Babu Shrish Chandra has given one, at least, of the typical characters, of every class of men composing the Hindu society of those days. The character of the Brahman priest, the Tol Pundit, Shiromani Bhattacharyya and his pupil Brajanath are faithful and life-like

Though Babu Shrish Chandra lacks the brilliancy, the wit, and the grandeur of Bankim Chandra, he is much more likely to be appreciated by those who prefer quiet scenes, tender feelings, and unpretending devotion. The style of the book is very simple ; it is far from being vulgar or indelicate ; it rarely rises to eloquence, but never loses its dignified perspicuity.

Babu Shrish Chandra is a young man with exquisite literary tastes ; he has much greater opportunities of observing Mufassal life than any of the other novelists of Bengal. He received his training at the feet of Babu Bankim Chandra, who, at one time, thought of making over the *Banga Darshan* to him. As a collaborateur of Babu Robindra Nath in editing a volume of ancient songs in Bengali, he has done valuable service to Bengali literature ; but the bent of his mind is for realistic novels—a field which affords much scope for distinction to young aspirants for fame, and we are glad to see that Babu Shrish Chandra is giving a promise. We shall watch his literary career with interest, and should like to see him take the place of Babu Sanjib Chandra Chatterji, or Tarak Nath Ganguli, the only realistic writers of distinction in Bengal.—*The Calcutta review ; October, 1894.*

Chaibassa
8-8-96

My dear Srish Babu,

I have delayed writing to thank you for your book until I had finished reading it. This I have now done. I think that it (Kritagnata) is the best that you have written yet : the story forms a coherent and well proportioned whole.

* * * * * *

Yours Sincerely,
Sd. C. H. Bompas.

"শ্রীশ বাবুর ফুলজানি এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাস। ইহার স্বচ্ছতা, সরলতা, ইহার ঘটনার বিরলতাই ইহার প্রধান সৌন্দর্য্য। * * এই উপন্যাসের ইতস্ততঃ যেখানে একটু অবকাশ পাইয়াছে, সেইখানেই লেখকের একটি নির্ম্মল স্নিগ্ধ হাস্য সকৌতুকে প্রবেশ করিয়া সমস্ত লোকালয় দৃশ্যটিকে উজ্জ্বলতায় অঙ্কিত করিয়াছে।

* * পরিচিত সহজ সৌন্দর্য্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ; বাঙ্গলার লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশ বাবুর সেই ক্ষমতাটি আছে, * *"—সাধনা; অগ্রহায়ণ; ১৩০১। (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শক্তিকানন। * * শ্রীশ বাবুর বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন। ইঁহারই তত্বাবধায়কতায় বঙ্গদর্শন একদিন বিশেষ তেজের সহিত চলিয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ বাবুর উপন্যাস লেখা এই প্রথম। এই প্রথমেই শ্রীশ বাবু তাঁহার রচনায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। * * *

লেখক এ পুস্তকে কেবল গল্পই লিখিয়া যান নাই। তাঁহার নিজের জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন * * *

জগন্নাথ এবং জগদীশ ছাড়া ইহাতে আরও অনেকগুলি চিত্র দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই যথাযথ বর্ণে প্রতিফলিত। হরিদাসের প্রভুভক্তি ও সরল গোঁড়ামি, লোকনাথের নির্দ্দোষ দুষ্টামি, হৈমবতীর লজ্জাসর্ব্বস্ব প্রেমভরা ভাব, মৃণ্ময়ীর কোমলে কঠোর গৃহিণীপনা, প্রভার বালিকাসুলভ খেলাধূলা আর হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া কথা কহা, এগুলি বড় মধুর। এত মধুর যে ইহাদের পার্শ্বে সেই দুষ্টা নাপিত বৌ ও দুরন্ত কাপালিক উদ্ধবকে দেখিলেই গ্রন্থকারের উপর পর্য্যন্ত আমাদের রাগ হয়। * * *

ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে ইহার ভাষায়। আগাগোড়া এক চমৎকার মোহিনী ভাষায় লিখিত। পাঠক সে ভাষার সৌরভে এতই মত্ত হইয়া পড়েন যে অন্যান্য গুণ দোষ বিচারের ক্ষমতা তাঁহার তত থাকে না! আমরা এত মিষ্ট ভাষায় উপন্যাস আর কখন পড়ি নাই। স্থানে স্থানে বর্ণনাগুলি অতি সুন্দর; এত সুন্দর যে তাহা পড়িতে পড়িতে আমরা মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের আশপাশ সব ভুলিয়া, কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। লেখকের ইহা সাধারণ ক্ষমতা নহে।—কল্পনা; ৫ম খণ্ড; ১৯৮ পৃঃ।

* * * বলিতে আহ্লাদ হইতেছে, অনেক দিন পরে, আজ আমরা নূতন লেখকের একখানি ভাল উপন্যাস পাইয়াছি।

দেড় শত বৎসর আগেকার বাঙ্গলা লইয়া শক্তিকানন রচিত। শক্তিকাননের সমস্তই গ্রাম্যদৃশ্য, গ্রাম্য লোকের জীবনকাহিনী। সহরের সঙ্গে বইখানির বড় সংস্রব নাই। লেখক এই গ্রাম্যদৃশ্যে বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন যে, বইখানি পড়িতে পড়িতে তরুলতাহিল্লোলিত বিহগবিহগীকূজিত বাঙ্গালার শ্যামসুন্দর চিত্রখানি

আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, এবং তাঁহার মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহরের মধ্যে বসিয়া সহর ভুলিয়া যাই। * * *

শক্তিকাননের এই পবনহিল্লোল, এই পাপিয়া কোকিলের স্বরলহরীর মধ্যে থাকিতে থাকিতে আমাদেরও এই কোলাহলময় ইটকাটের সহরকে নির্জ্জন নিকুঞ্জ বলিয়া আত্ম-বিস্মৃতি জন্মে।

বাঙ্গালার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যায় বাঙ্গালার মনের দৃশ্যও সাধারণতঃ লেখক বেশ আঁকিয়াছেন। গৃহবধূ হৈমবতীর সলজ্জ প্রেমময় ভাব, বিধবা ননদের কর্ত্তৃত্ব অথচ মমতা-ময়ী ভাব, জগন্নাথের হরিভক্তি, বালক লোকনাথের সরল দুষ্টামি, বালিকাপ্রভার বালিকার মতই সরলতা, এ সকলি সুন্দর হইয়াছে। * * *

শক্তিকানন একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস, ইহার ভাষা চমৎকার, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী, চরিত্রও সাধারণতঃ প্রস্ফুট।—ভারতী; ১১শ ভাগ; ভাদ্র ও আশ্বিন; ১২৯৪।

ইহা ভিন্ন, নব্যভারত ও বামাবোধিনী, হিতবাদী, ভারতবাসী, দৈনিক, ইণ্ডিয়ান মিরার, কলিকাতা গেজেট ও এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক রিপোর্ট প্রভৃতিতে শ্রীশ বাবুর শক্তি-কানন, ফুলজানি, কৃতজ্ঞতা, বিশেষ প্রশংসার সহিত সমালোচিত হইয়াছে। বাহুল্যবোধে সে সমস্ত এখানে উদ্ধৃত করা গেল না।

শ্রীশবাবুর পুস্তক সম্বন্ধে—রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বলেন, "বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুম-দারের সমস্ত উপাখ্যানই উপন্যাস নামের যোগ্য; এবং উপন্যাস-কাব্যের মধ্যে উচ্চ-সম্মানার্হ।

আমরা শ্রীশচন্দ্রের 'কৃতজ্ঞতা,' 'বিশ্বনাথ,' 'শক্তিকানন ও 'ফুলজানি' এই চারিখানি গ্রন্থ পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়াছি; এবং পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, তিনি শব্দসম্পদে যেমন সমৃদ্ধ—ভাব-সম্পদে যেমন বৈভবশালী, চরিত্রের বিশ্লেষ, বিকাশ এবং ঘটনার বৈচিত্র-চিত্রণেও, সেইরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কবি। বস্তুতঃ, তাঁহার এই চারিখানি উপন্যাস বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটা দিক্‌ আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছে, এবং সে নিরাবিল আনন্দভোগে সকল শ্রেণীস্থ পাঠকরই বিশেষ উপকার হইতেছে।

শ্রীশ বাবুর 'কৃতজ্ঞতা' বর্ণনার পরিণাম-রমণীয়তায়, তুলসী চন্দনের মত পবিত্র। উহার প্রথমাংসে পিশাচ ও পিশাচীর কথা থাকিলেও, সে কথা প্রবৃত্তিকে মন্দদিকে আকর্ষণ করে না; মন্দকে ভালজ্ঞানে ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মায় না। কিন্তু, উহার উপসংহারে পঁহুছিলে হৃদয় আপনা হইতেই উৎকর্ষের একটুকু উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করে;—যে অতিমন্দ,

সেও মুহূর্ত্তের তরে ভাল'র নিকট মাথা নোয়াইতে ভালবাসে! সমৃদ্ধ হিন্দুপরিবারের সুন্দরী, সুশিক্ষিতা স্বাধীনা যুবতী, সর্ব্বপ্রকার বিলাস দোলায় দোলায়িত রহিয়াও, কিরূপে হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং সাংসারিক জীবনের বহিশ্চত্বরে ঋষিতাপসের আরাধ্য নির্ম্মলতাকে তদ্গত প্রাণে পূজা করিতে পারে, তিনি স্ফুট চিত্রে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন ; এবং অঙ্কন-নৈপুণ্যে, কবিত্ব ফলাইয়াছেন।

'বিশ্বনাথ' কিয়দংশে উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু বিশ্বনাথ-চরিত্রের ঐতিহাসিকতা স্মরণ করিলে সে কথা মনে থাকে না। ইহার একধারে জাতী-যূথী-কুন্দ-কলিকা-পরিশোভিত গার্হস্থ্য উদ্যান, একধারে সর্প-শ্বাপদ-সঙ্কুল কণ্টক বৃক্ষময় গহন-কানন। কিন্তু দুইয়ে বড় সুন্দর মিশিয়াছে।

* * *

শ্রীশচন্দ্রের 'ফুলজানি' বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব পদার্থ। ইহাকে অতি উৎকৃষ্ট দার্শনিক-কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সে কথা কোনও অংশে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার আগাগোড়া সর্ব্বত্রই প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি ও রসভাবকতার বিচিত্র মিশ্রণ পাঠকের হৃদয় ও মনকে আকর্ষণ করে। এবং নিত্য পরিলক্ষিত গার্হস্থ জীবনেরও কতপ্রকার সামাজিক শক্তি, মানবজীবনের উপযুক্ত বিকাশ অথবা আশানুরূপ পূর্ণতা লাভের পথে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে কার্য্য করিয়া, এই সংসারের সুখ-দুঃখাবহ বিচিত্র ঘটনায় পরিণত হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়া বিস্ময় জন্মায়।

আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি যে, শ্রীশবাবু যদি তাঁহার 'ফুলজানি' ছাড়া আর একখানি উপন্যাসও রচনা না করিতেন, তথাপি তিনি ঔপন্যাসিক-সাহিত্যে অতি উচ্চ আসন অধিকার করিতেন।

* * * *

শ্রীশ বাবুর উপন্যাসনিচয় সম্বন্ধে উপসংহার স্থলে আমাদিগের আর একটি কথা বলিতে আছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত বঙ্গমহিলার সাধারণতঃ কোন সম্পর্ক ছিল না। ইদানীং বঙ্গমহিলাই বাঙ্গালা গ্রন্থপত্রের উৎসুক পাঠক, এবং উপন্যাস সাহিত্যই তাঁহাদিগের মনোমোদক। কিন্তু বঙ্গীয় পুরসুন্দরীরা যে জাতীয় উপন্যাস লইয়া সময় যাপন করেন, তাহার অধিকাংশই অতি কদর্য্য—কোন কোন পুস্তক ভদ্রমহিলার অস্পৃশ্য। যে সকল উপন্যাস, রচনার চমৎকারিত্ব অথবা অন্যগুণে আদর যোগ্য, তাহারও প্রধান একভাগ কুলযুবতীর অপাঠ্য। এ অংশে শ্রীশবাবুর উপন্যাস নিচয়

রমণীমোহন—রমণীয়তায় অতিমাত্র সুন্দর হইয়াও, সুরুচির পথ প্রদর্শক, এবং আদ্যোপান্ত সকল স্থলে রসপূর্ণতায় মধুর হইয়াও, সুপেয় স্বাদুদুগ্ধের ন্যায় উপকারক। তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"গো-রস গলি গলি ফিরি
সুরা বৈঠ্ বিকায়।"

অর্থাৎ, সুখ-সেব্য গব্য দুগ্ধ লইয়া ফিরিওয়ালারা গলিতে গলিতে ঘুরিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ায়; সুরা, আপনার ঘরে বসিয়াই, পিপাসুকে আকর্ষণ করে। শ্রীশ বাবুর লেখা সত্যই এই উভয়-লক্ষণাঙ্কিত। উহা সুরা অথবা মদিরার ন্যায় চিত্তরোচক, অথচ গো রসের ন্যায় পবিত্র, প্রীতিকর ও পুষ্টিবর্দ্ধক। উপন্যাস-রচনায় ইহার উপর আর অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে? বঙ্গীয় কুলকামিনীরা এই উপন্যাসগুলির সমস্ত কথা কণ্ঠস্থ করিতে পারিলে, তাঁহাদিগের অশেষ সুশিক্ষা হইবে; দেশেরও বিশেষ উপকার দর্শিবে। বান্ধব.—পৌষ ১৩১০।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—

"পরিচিত সহজ সৌন্দর্য্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ, বাঙ্লার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই ক্ষমতাটি আছে।" সাধনা—অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

বঙ্গবাসীর বিস্তৃত সমালোচনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। "শ্রীশবাবুর উপন্যাসগুলি পাঠে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। বর্ত্তমান বঙ্গে শ্রীশবাবুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক তাঁহার গ্রন্থগুলি পাঠে আমাদের এই ধারণাই জন্মিয়াছে।"

স্থানাভাবে অন্যান্য সমালোচনা উদ্ধৃত হইল না।